পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারি – ডিসেম্বর ২০১২

আধার কার্ড
প্রফুল্লচন্দ্র কি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন?
সুপারপাওয়ার আমেরিকার স্বার্থে বিপথচালিত বিজ্ঞান
ভূ-উষ্ণায়ন-অন্য-তত্ত্ব
প্রেসিডেন্ট ওবামার দ্বিতীয় দফা
জি. এম. খাদ্যের সম্ভাব্য বিপদ
রাইস মিলের দূষণ
চাঁদনী জল
পেঁপে পাতার নির্যাস ও ডেঙ্গু
চায়না ভ্যান

জলাভূমি আন্দোলনের শহীদ তপন দত্তের হত্যাকারীদের ধরা
ও আইনত বিচার করার দাবী জানাই। এটা যদি না করা যায়—জলাভূমি নিয়ে
নতুন ভাবনা-চিন্তা-পরিকল্পনা কখনই বাস্তবায়িত করা যাবে না।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ১-৪ ❑ জানুয়ারি — ডিসেম্বর ২০১২

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ১-৪
জানুয়ারী -২০১২ ডিসেম্বর ২০১২

❑

প্রযত্নে : রবীন মজুমদার
বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

❑

মূল্য : পঁচিশ টাকা

❑

Vigyan O Vigyankarmi
Rn.No.34929/79

❑

Vol. XXXIV No. 1-4
January 2012-December 2012

❑

Commmmunication :
C/O Rabin Majumdar
B 27/1 Kalindi Housing Estate
Kolkata 700 089

❑

Website : www.scienceandsocietyinbob.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা ৩

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর তথা আধার কার্ড—রবীন চক্রবর্তী ৪

আবহাওয়া পরিবর্তনে বিকল্প মহাকাশীয় তত্ত্ব .....সার্ন (CERN) -এ পরীক্ষা — কুমারেশ মিত্র ১১

ওবামার দ্বিতীয় দফা : পরিবেশ নীতি—প্রদীপ দত্ত ১৭

মার্কিন দেশে স্যান্ডি ঝড়—শুভাশিস মুখার্জি ১৯

পেটেন্ট ও ওষুধের কিস্যা—শুভাশিস মুখার্জি ২১

সুপার পাওয়ার আমেরিকার উত্থানে ফ্লুরাইড দূষণের ভূমিকার নেপথ্য কাহিনী—মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ২৩

এক বিদ্যানিধি এক মহারাজ ও "বিজ্ঞান"—অমিত চৌধুরী ২৮

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন না—রবীন মজুমদার ৩০

বিজ্ঞান চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ—অমূল্য মণ্ডল ৪৩

শক্তি : তিনটি চিত্র—রবীন ব্যানার্জি ৪৫

জি. এম. খাদ্যের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে জীববিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গব—অবনী ভট্টাচার্য ৪৮

রাইস মিল থেকে জল ও বাতাস দূষণ—সুজিত দাস ও রবীন ব্যানার্জি ৪৯

পেঁপে পাতার নির্যাস ডেঙ্গুঁরোগীদের এক আশ্বর্য ওষুধ?—সেঁজুতি মণ্ডল ৫০

আকাশবিহারী চাঁদের বারি—নিখিলেশ পাল ৫২

পরিক্রমা ৫৪

আবার দোহা, আবার ভূ-উষ্ণায়ন/ কীটনাশক না প্রাণনাশক /ভোপাল : অন্য আমেরিকার একটি নাটক/ চায়না ভ্যান

(শুভাশিস মুখার্জি, ভাস্কর মৈত্র, রবীন ব্যানার্জি)

আমাদের কথা

বুড়ো বি ও বি আবার চলল ২০১৩'র বইমেলায়। বুড়ো বইকি অবশ্যই বুড়ো! বিজ্ঞানকে উপজীব্য করে কটা সাময়িক পত্র ৩৪ বছর ধরে মোটের উপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে? তাও আবার কোন প্রতিষ্ঠানিক আনুকূল্য বা সহায়তা ছাড়া, কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় না থেকে?. তবে আমরা বুঝতে পারছি এ ভাবে আর চালানো যাবে না। প্রত্যেকবারই মনে হয় এবারই বোধহয় শেষ বেরোল বিওবি, সেই ট্রাডিশন চলছেই।

অবশ্য চারপাশে তাকালে বুঝি যে একা নই আমরা, অনেকেরই এমনিই অবস্থা।

কেন এমন অবস্থা? বিওবি যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে শুরু করেছিল—বিজ্ঞানকে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া আর সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে আসা—সে প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে? তা তো নয়! বরং সে প্রয়োজন আরও বেড়ে গেছে। তবে কেন এধরনের সমস্ত উদ্যোগ প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছে? কেন তরুণ যারা তাদের আকৃষ্ট করতে পারে না বিওবি বা তার মতো পত্রপত্রিকা? বয়সে যারা নবীন, তারা এগিয়ে এসে পুরোনদের কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেবে, নতুন দিশা, নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে, এটাইতো হওয়া উচিত। তাহ'লে হয় না কেন? নবীনদের দোষ ধরেন অনেকে। কিন্তু আমাদের মনে হয় সেটা আদৌ ঠিক নয়। আমাদেরই ভুল হয়েছে কোথাও। সেটার খোঁজও আমাদের কাজের মধ্যেই পড়ে। এবারের বিওবিতে অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের পাশাপাশি সেই খোঁজের কিছু নমুনাও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না নিশ্চয়ই যে আমাদেরই ভুলের উত্তরাধিকার বর্তাচ্ছে অনুজদের উপর। আমরা বিজ্ঞানকে এনেছি এক বিদেশী পণ্যের মত। নিজেদের শেকড়ের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় যত্নবান থাকিনি। ভুলে গিয়েছি নিজেদের অতীত; নিজেদের অগ্রজদের অগ্রাহ্য করে নিছক আমদানি করে গেছি—সৌধ, যন্ত্রপাতি, কল কারখানা পণ্য। আর তাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছি স্বার্থপরের মত। কাজেই বিওবি'র ভবিতব্য এক ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতার বিপন্নতার ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক হিসেবে এটা আমাদের রাজ্যের এবং দেশেরও বিপন্নতার ধারাবাহিকতা। স্বাধীনতা-পরবর্তী পঁয়ষট্টি বছর যেন সেই বিচ্ছিন্নতার বিপন্নতার ধারাবাহিকতারই বিভিন্ন অঙ্ক। প্রতিবার পরিবর্তনের আশা জাগায়, কিন্তু যেখানে তা দরকার সেখানে পরিবর্তন হয় না কিছুই, যেখানে তার দরকার নেই উল্টে যেখানে দরকার ভিতটাকে আরও শক্ত পোক্ত মজবুত করবার ধারাবাহিকতা, সেখানে সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। প্রতিবার শূন্য থেকে শুরু করো—তাকিয়ে থাকো দূরের কোন দেশের দিকে.....

আমাদের রাজ্যটা এর ভালো উদাহরণ। সাতচল্লিশ- উত্তর তিরিশ বছর জন্ম দিল নতুন আশার। আরও তিরিশ পার করে আবিষ্কৃত হল—আশা ছিল কুহকিনি! তবুও আশাই ভরসা আশাই জীবন। তাই আবারও হয়েছে পটপরিবর্তন। মাত্র আঠারো মাসের চলনে শৈশবের জড়তা অনভিজ্ঞতা অসহায়তার ছাপ। তবু আছে কিছু নতুনের ইঙ্গিত, আশার হাতছানি। পঁয়ষট্টি পার করা স্বাধীন এ ভারতে কোনদিন কোন দুর্বল শিশু কি জেদ ধরেছে—চাইনা—পরমাণু বিদ্যুৎ, চাইনা খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজির চাকচিক্য, চাইনা জিন বদলানো খাদ্য? আমরা পরখ করবো আত্মশক্তির, দাঁড়াবো নিজের পায়ে? কিন্তু এ পোড়া দেশে শিশুরাই সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠুরতার শিকার!

পারবে কি এ শিশু আত্মবিশ্বাসী আত্মপ্রত্যয়ী সাবালক হতে? আবেগে লাগাম লাগিয়ে যুক্তিতে শান দিয়ে পরিকল্পনায় টান টান হতে? কেন না প্রতিকূলতা দেশজোড়া শুধু নয় বিশ্ব জোড়া।

চাই শিকড়-ছড়ানো বিজ্ঞান, মানবিক মুখের বিজ্ঞান। তা চিনে নিয়ে নতুন পথে আত্মবিশ্বাসী দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলতে হবে মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে।

বিওবি'র সব পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

ইউনিক আইডেনটিটিফিকেশন নম্বর তথা আধার কার্ড

রবীন চক্রবর্তী

ভারত সরকার ঠিক করেছে যে ভারতবাসী প্রত্যেককে এক-একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করবে । আগামী দিনে এই সংখ্যাই হবে অফিস কাছারি ব্যাঙ্কের কাজে পরিচয়পত্র । যেকোনো দুটি মানুষ যেমন আলাদা, তেমনি দুটি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাও আলাদা হবে। একটি সংখ্যা দিয়ে একটি মানুষকেই বোঝাবে । ফলে আমরা এখন থেকে সবাই এক-একটি নম্বর হয়ে যাচ্ছি । রবি ঠাকুরের তাসের দেশের মত ছক্কা পঞ্জা আর কি ! তবে এক্ষেত্রে সংখ্যা-নামটি এত ছোট হবে না! প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে বারো অঙ্কের এক-একটি সংখ্যা । যেমন একজনের সংখ্যা যদি হয় ১২৩৪৫, ৬৭,৮৯,১২৩, মানে বারো হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ উননব্বই হাজার একশো তেইশ, তাহলে কেমন হবে? তবে এত বড় সংখ্যা মনে রাখতে হবে এমন না । সরকার একটি করে কার্ড দেবে। তাতেই থাকবে সেই সংখ্যা। আর আমাদের নাম, ধাম, ইত্যাদি। আর থাকবে আমার বৈশিষ্টসূচক দেহের দুটি চিহ্ন। অফিসে আদালতে ব্যাঙ্কে থানায় পরিচয় জানতে চাইলে কার্ডটি এগিয়ে দিলেই হবে। এই পরিচয়পত্রের নাম দেওয়া হয়েছে ইউআইডি বা ইউনিক আইডেনটিটিফিকেশন নম্বর। দেশের যেকোনো জায়গাতেই এই কার্ড সঙ্গে থাকলে আর চিন্তা নেই।

ইউআইডি কার্ড কি

এতদিন যে সমস্ত পরিচয়পত্র চালু ছিল সেগুলিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করা হচ্ছে না। ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ইতাদি পরিচয়পত্র চাইলেই জাল করা যায়। জাল হয়ও । তার খবর আমরা দৈনিক কাগজে পড়ি। ফলে সরকার এমন এক ধরনের পরিচয়পত্রের সন্ধান করছিল যাতে পরিচয়পত্রের সাথেই ওই ব্যক্তির বৈশিষ্টসূচক কোনো চিহ্ন যুক্ত থাকবে। যাতে চাইলেই সেটা যাচাই করে নেওয়া যায়। অর্থাৎ অথিনটিকেট করা যায়।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। ইউনিক আইডেনটিটিফিকেশন কার্ড হল তেমন চিহ্ন-যুক্ত পরিচয়পত্র। প্রত্যেকের পরিচয়পত্রে তাঁর মুখের ছবি ছাড়াও দশ আঙুলের ছাপ ও চোখের মণির ছবি সাংকেতিকভাবে সাঁটান থাকবে -ছোট্ট একটি ইলেকট্রনিক মাইক্রোচিপে। আগামী দিনে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, থানা, জেল, আদালত, রেশন দোকান, রেলের কাউন্টার সর্বত্র এই চিহ্ন যাচাই করার যন্ত্র থাকবে। যেখানেই কাজের জন্য যাবেন এই কার্ডটি লাগবে। পরিচয়পত্র হিসেবে কার্ডটি দেখাতে হবে। কাউন্টারের ব্যক্তি সেটা ইন্টারনেটে যুক্ত একটি যন্ত্রের খোপে ঢুকিয়ে চেক করে দেখবে। যদি সন্দেহ হয় যে আপনি সত্যি-ই কার্ডের মালিক কিনা, তখন আপনার আঙ্গুলের ছাপ কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডারে রাখা রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে দেখবে। পর্দায় ভেসে উঠবে দুটি শব্দের একটি -হ্যাঁ, কিংবা না। ব্যস, প্রমাণ হয়ে যাবে আপনি আসল না নকল। এর নাম অথেনটিকেশন। আর এই হল নতুন পরিচয়পত্রের বৈশিষ্ট। ভূয়ো পরিচয়পত্র দিয়ে বিভিন্ন ঠিকানায় রেশন কার্ড, ব্যাঙ্ক একাউন্ট ইত্যাদি বানানোর দিন শেষ।। এখানে মনে করিয়ে দিই যে ওই কাউন্টারের ভদ্রলোক বা যে কেউ ইন্টারনেট মারফৎ হ্যাঁ কিংবা না-এইটুকু জবাবই পেতে পারবেন। এর বেশি কিছু তথ্য ওখান থেকে পাওয়া যাবে না। এমন ব্যবস্থাই করা হয়েছে। তার মানে যে কেউ চাইলেই একটা বারো অংকের সংখ্যা দিয়ে সার্চ করে কারো হাঁড়ির খবর জেনে নেবে এমনটা সম্ভব হবে না।

শুধু হ্যাঁ কিংবা না এইটুকু জানানর ব্যবস্থাই হয়েছে। খুবই সরল ব্যাপার মনে হবে। কিন্তু এই সরল ব্যবস্থাটি গড়ে তুলতে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। খুবই জটিল ও ব্যয়বহুল সেই ব্যবস্থা। শুধুমাত্র কার্ড বহনকারী ব্যক্তিই আসলে কার্ডের

অধিকারী কিনা এইটুক যাচাই, মানে অথেনটিকেট করে নেবার জন্যই এত কান্ড ! এজন্য নতুন একটি সংস্থা তৈরি করতে হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনের অধীনে ইউনিক আইডেনটিটিফিকেসন অথরিটি অব ইন্ডিয়া নামে।

কেন ইউআইডি

শুধুমাত্র পরিচয়পত্র তৈরির জন্য এত আয়োজন এত অর্থব্যয় কেন এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।সরকার বলছে এটা আর্থিক দুর্নীতি রদ করার কাজে লাগবে। ই-গভরনেন্সের কাজেও লাগান যাবে। এতে দরিদ্র মানুষদেরও উপকার হবে। কারণ এই বিশেষ পরিচয়পত্রের সাহায্যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অর্থ তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। পাওনা টাকা তাদের নামের ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা হয়ে যাবে। এর জন্য মাঝপথের প্রশাসনিক কর্তাদের সই-সাবুদের ঝামেলা থাকবে না। প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার জন্য সরকারি বাবু বা পার্টির বাবু-বিবিদের দোরে হত্যে দিতে হবে না। যোগ্যতা-তালিকায় নাম থাকলে প্রতিবার আর যোগ্যতা যাচাইয়ের দরকার নেই। এতে সময় বাঁচবে। মাঝপথের তোলাবাজদের দৌরাত্মও কিছুটা কমবে। অর্থাৎ সরকারী জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে একশো টাকা বরাদ্দের মাত্র পনের টাকা লোকের হাতে পৌঁছনর যে অভিযোগ চালু আছে, তার খানিকটা হলেও মোকাবিলা করা সম্ভব বলে সরকার মনে করছে।

সম্ভবত ইনফোসিসের এক সময়ের সিইও নন্দন নিলেকানির 'ইমাজিনিং ইন্ডিয়া' নামের বইটি তাদের এই ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। ওই বইতে নিলেকানি নানান দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে কিভাবে প্রশাসনিক কাজে গতি আনা যায়, দুর্নীতি ঠেকানো যায়, কাজে স্বচ্ছতা আনা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি কর্নাটক রাজ্যের ল্যান্ড রেকর্ডস কম্পুটারাইজ করার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলেছেন যে বহু টালবাহানার পর সরকার এই কাজে উদ্যোগী হয়েছিল। তারপর কাজ শেষ হওয়ার পর সবাই অবাক হয়ে দেখল যে জমি লেনদেনের কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। জমি সংক্রান্ত খোঁজখবরের কাজটা এক সময় কি ভয়ের ব্যাপার ছিল। স্থানীয় অফিসের বাবুদের হাত তৈলাক্ত না করে কোনো কাজ উদ্ধার করা যেত না। এখন সেই কাজ আঙ্গুলের ডগায় এসে গেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তে দেখে নেওয়া যায় সব তথ্য। ফলে ল্যান্ড রেকর্ডস দপ্তরে বাঁ-হাতের কারবার অনেকটাই বন্ধ এখন।

প্রকল্পের মাথায় কারা

সেজন্যই বোধহয় ইউআইডি প্রকল্পের হাল ধরার জন্য সরকার ইনফোসিসের এই প্রযুক্তিবিদকেই ডেকে এনেছে। তাঁকে চেয়ারম্যানের পদে বসান হয়েছে। ক্যাবিনেট-মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তিনিও কর্পোরেট দুনিয়ার অর্থকরী পদ ছেড়ে নতুন পদে যোগ দিতে দেরি করেননি। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে কার্যভার নিয়েছেন। মাস তিনেকের মধ্যে দুনিয়া টুঁরে জনা কুড়ি প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক কাজে দক্ষ লোককে এই কাজে সামিল করেছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন অনাবাসী ভারতীয় প্রযুক্তবিদ রয়েছেন, যাঁরা প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে এই কাজে মদত দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। প্রয়োজনীয় সফটঅয়্যার তৈরিতে সাহায্য করেছেন। সফটঅয়্যার বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রথম যিনি যোগ দেন তাঁর নাম শ্রীকান্ত নিধামুনি। এর পর একে একে ইনভেনট্রি ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ প্রমোদ ভার্মা, ই-গভরনেন্স-এ বিশেষজ্ঞ এস শর্মা, উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক কাজে অভিজ্ঞ উইলি ওয়েড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংক্রান্ত কাজে বিশেষজ্ঞ সলিল প্রভাকর এই টিমে যোগ দেন।

জটিলতা কোথায়

খুবই জটিল এই কাজ। সেজন্য নানান বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকজনদের একত্র করতে হয়েছে। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে জটিলতার কারণটি। আনুমানিক একশো কুড়ি কোটি লোকের দেশ ভারত। যাদের বেশির ভাগই ছড়িয়ে আছেন দূর দূরান্তের গ্রামেগঞ্জে ক্ষেতখামারে পাহাড়ে জঙ্গলে। তাদের সাথে কথা বলতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। আঙ্গুলের

ছাপ চোখের মণির ছবি নিতে হবে। মানে প্রথমত তাদের সকলের কাছে পৌঁছতে হবে। পৌঁছতে হবে কমপিউটার, ক্যামেরা, হাতের-ছাপ চোখের মণি স্ক্যান করার যন্ত্রপাতি নিয়ে। এজন্য লাখ-খানেক দক্ষ কর্মী দরকার! তাদের পরিচালনা করার মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা দরকার। তারও আগে দরকার সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্য কাজে লাগাবার উপযোগী সফ্টঅয়্যার নির্মাণ। দরকার নিরবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা। তার জন্য যন্ত্রপাতি। লক্ষ লক্ষ কেন্দ্র থেকে এক যোগে যে তথ্যের পাহাড় এসে জড়ো হবে সেগুলির যথার্থতা খতিয়ে দেখতে হবে। তার জন্য দরকার নানান সংস্থার তথ্য ভান্ডারের সাথে তথ্য মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা। ব্যক্তিপরিচয় গোপন রাখার একটা ব্যাপার রয়েছে এখানে। তাই প্রয়োজন সাংকেতিক চিহ্নের আড়ালে সব তথ্য আড়াল করার ব্যবস্থা। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বারো অঙ্কের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা। এটা রাজ্য-ধরে, নামের আদ্যাক্ষর-ধরে বা এমন কোনো শৃঙ্খলা মেনে করা যাবে না। একেবারেই এলোমেলো ভাবে এই সংখ্যা নির্দ্ধারণের কাজটা করতে হবে, যাতে কোনো ভাবেই এই পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডারের সূত্র ধরে ওই ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্যর হদিশ করা না যায়। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে এমনই আশ্বাস মিলেছে ইউআইডি কতৃপক্ষের কাছ থেকে। যদিও এই পরিচয়পত্রে খুব বেশি তথ্য কিছু থাকার কথা নয়। কয়েকটি মামুলি তথ্যই থাকার কথা। নাম, ঠিকানা, জন্ম-তারিখ, পিতা/মাতার নাম, আর লিঙ্গ-পরিচয় -এইটুকুই। তথ্য সংগ্রহের সময় জাতি, ধর্ম, পেশা, ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো তথ্য নথিবদ্ধ করার কথা নয়। মনে রাখতে হবে শিশু বৃদ্ধ জোয়ান সব বয়েসের মানুষের জন্যই এই পরিচয়পত্র তৈরি করা হবে এবং সবার ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনে চলার কথা।

কিভাবে হবে কাজ

কাজের পরিমাণটা একবার ভাবার চেষ্টা করা যায়। একশো কুড়ি কোটি মানুষকে যদি শুধু গুনতে বলা হয় তাহলে সেকেন্ডে একজন করে গুণলে একশো কুড়ি কোটি সেকেন্ড। মানে ৩লক্ষ ৩৩হাজার ৩৩৩ ঘন্টা লাগবে। দিনের হিসেবে ১৩ হাজার ৮৮৮দিন বা প্রায় ৩৮ বৎসর !

দেশের কোনে কোনে ছড়িয়ে আছে এই মানুষেরা। এদের কাছে পৌঁছতে হবে। তাদেরকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। একটা ফর্ম ফিল-আপ করাতে হবে। যাতে নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ইত্যাদি রেকর্ড করতে হবে। প্রামাণ্য দলিলের সাথে সেটা মিলিয়ে দেখতে হবে। তেমন দলিল না থাকলে পাড়ার কাউকে দিয়ে তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে হবে। এছাড়াও কিছু বিষয়ে হ্যাঁ-না জবাব নিতে হবে। যেমন মোবাইল ফোন থাকলে তার নম্বর, ই-মেল একাউন্ট থাকলে তার ঠিকানা। ব্যাঙ্ক একাউন্টের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে চাইলে ব্যাঙ্কের একাউন্ট নম্বর রেকর্ড করা। তারপর আছে যন্ত্র দিয়ে দশ আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া। সেটা একবারে হবার নয়। কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ কায়িক শ্রম করে থাকেন। তাতে তাদের হাতের সুক্ষ্ম রেখা সব আবছা হয়ে আসে। ফলে বার কয়েক চেষ্টা করে এই ছাপ সংগ্রহ করতে হবে। এরপর আছে চোখে বাইনাকুলারের মত একটা যন্ত্র ধরে চোখের মণির ছবি স্ক্যান করা। এতসব করতে জনপ্রতি কম করে পনের মিনিট থেকে আধ ঘন্টা সময় তো লাগবেই। তাহলে একশ কুড়ি কোটি লোকের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্যটুকু সংগ্রহ করতে কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে আন্দাজ করা যায়। যদি এক সাথে এই কাজে পঞ্চাশ হাজার লোক নিযুক্ত করা যায় এবং চারজন করে গ্রুপে কাজ করে তাহলে জনপ্রতি পনের মিনিট হিসেবে তথ্য রেকর্ড করতেই লাগবে মোট ২৪০০০ঘন্টা বা প্রায় পৌনে তিন বছরের মত সময় । এটা হল নীট সময় । দিনে আট ঘন্টা কাজ ধরলে শুধুমাত্র প্রাথমিক তথ্যটুকু সংগ্রহ করতে প্রায় সোয়া আট বছরের ধাক্কা !

কাজ কদ্দুর এগিয়েছে

কাজ শুরু করার সময় বলা হয়েছিল প্রথম পর্যায়ে ২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ২০কোটি মানুষের

কাছে এই কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। সেটা সম্ভব হয়নি। তবে খুব বেশি দেরিও হয়নি । পরম সন্তোষের কথা যে ২০১২ সালের শেষে এসে ১৯ কোটির বেশি লোকের কার্ড তৈরি হয়ে গেছে। এবং আরও ২ কোটির মত লোকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তথ্য হাতে পাওয়া থেকে কার্ড তৈরির কাজ শেষ করতে প্রায় নব্বই দিনের মত সময় লাগছে। অচিরেই বাদবাকি সকলে কার্ড পেয়ে যাবেন আশা করা যায়। স্বীকার করতেই হবে প্রায় নির্ঘন্ট মেনেই কাজ চলছে এবং এই সংস্থার কর্মীদের এমন দক্ষতার জন্য সাধুবাদ জানাতেই হয় ।

এটা সম্ভব হয়েছে প্রথম পর্যায়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরল, মহারাষ্ট্রের মত রাজ্যে এই কাজ হাতে নেওয়ায়। এই সমস্ত রাজ্যেই ই-গভর্নেন্সের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ফলে দক্ষ কর্মী, যন্ত্রপাতি এবং মানসিকতা তৈরি ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে তো আঙ্গুলের চিহ্নযুক্ত রেশন কার্ডের প্রচলন হয়েছে আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে। এইভাবে সেখানকার ভূয়ো রাশন কার্ডের সংখ্যা অনেকটা কমানো গেছে। কর্নাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র প্রশাসনিক স্তরে কম্পুটার ব্যবহারের চর্চায় অনেকটাই এগিয়ে। ফলে কিছু সুবিধে মিলেছে এই পর্বে। শুরুতে কাজের গতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত মাত্রার থেকে কম হলেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সাথে সাথে কাজের গতি বেড়েছে। এর মধ্যে নানান বিতর্ক এবং প্রতিবন্ধকতা এসেছে। যেহেতু এই কাজ অন্য জনগণনা সংক্রান্ত সরকারি সংস্থার কাজের মতই, ফলে কাজের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেসব বাধা অতিক্রম করতে সময় গেছে। একটা সময় তথ্য সংগ্রহের গতি বেড়ে দিনে কুড়ি লক্ষের মত সংখ্যা ছুঁয়েছিল! দ্বিতীয় পর্বের লক্ষ্য হল ৬০ কোটি লোকের কাছে কার্ড পৌঁছনো। সময়সীমা ২০১৬ সাল। তবে এবার তথ্য সংগ্রহের কাজ ভাগাভাগি করে করা হবে। ন্যাশানাল পপুলেশন রেজিষ্ট্রারও তথ্য সংগ্রহের কাজ করবে ।

কোন কাজে লাগবে

সরকারের দাবী ইউআইডি কার্ড নিছক পরিচয়পত্র হয়ে থাকবে না। এই তথ্যের ভান্ডারকে সরকারের সমস্ত জনকল্যানমূলক কাজের উদ্যোগের সাথে যুক্ত করা হবে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত উদ্যোগের একটা অংশ নানান স্তরে দুর্নীতির কারণে অপচিত হচ্ছে । এই অপচয় রোধ করতে পারলে সেই অর্থে আরও কিছু মানুষকে এই সাহায্যের আওতায় আনা যায় । ইউআইডির তথ্যভান্ডর একাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে এই পরিচয় পত্রের নাম দেওয়া হয়েছে আধার, হিন্দি ভাষায় যার অর্থ হল ভিত্তি ।

সরকারের এই দাবী কতখানি সঙ্গত সেটা খতিয়ে দেখার জন্য কিছু কিছু সার্ভের কাজ হচ্ছে। যেমন ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসির কনসাল্টেটিভ গ্রুপ ফর অ্যাসিসটিং পুয়োর নামের গ্রুপ গত ৯ই নভেম্বর এ কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস অফ আধার নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ।

এদের অনুমান যদি প্রস্তাবমত সব ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে একটা সময়ের পর থেকে সত্যিই অর্থ সাশ্রয় হবে। এরা জানাচ্ছে যে ২০০৮-০৯ সালে গ্রামীণ রোজগার যোজনা, সারের ভরতুকি, গৃহনির্মাণ প্রকল্প, বিধবা ভাতা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফেলোশিপ, ইত্যাদি প্রধান ২২টি গ্রামীণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৩,২৫,০০০ কোটি টাকা । প্রকল্পভেদে এর ৭ থেকে ১২ শতাংশ অর্থ চুরি হয়েছে বলে ধরাই যায়। গড়ে দশ শতাংশ ধরলে অপচিত টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় বছরে ৩২হাজার ৫শো কোটি টাকা । নেহাত কম নয় এই অঙ্ক। এটা বছর বছর অপচয়ের অঙ্ক। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে সরকারি প্রকল্পে চুরির ব্যাপারটা নানান ভাবে নানান স্তরে ছড়িয়ে থাকে। সেটা কেবল মজুরি হাতে তুলে দেওয়া বা ভাতার টাকা হাতে ধরানর পর্যায়ের না। তার আগে কত রকম কেনাকাটা টেন্ডার অর্ডার ইত্যাদি পর্যায় থাকে। চুরি শুরু সেই ওপর থেকে। তারপর ক্রমে নিচে এসে গ্রামস্তরের দুর্নীতি। ফলে ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্র্যান্সফারের ফন্দী দিয়ে দুর্নীতির একটা সামান্য অংশকেই ঠেকানো যাবে।

লাভক্ষতির হিসেব

আধার কার্ড তৈরির কাজ অনুমান করা হচ্ছে ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে শেষ হবে। তবে তার পরেও সেই কার্ড-এর তথ্যভান্ডারের সংশোধন সংযোজনের কাজ চলতেই থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ের বিপুল ব্যয়ের তুলনায় সেই ব্যয় অনেক কম হবে। যেমন ২০২০-২১ সালে গিয়ে এই ব্যয় দাঁড়াতে পারে হয়তো ৪,৮৪৫কোটি টাকার মত । অপর দিকে সেই সময় সাশ্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৫,১০০কোটি টাকা। অর্থাৎ নীট লাভ দাঁড়াচ্ছে ২০,২৬৫কোটি টাকা। তবে এটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের গল্পের মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ এই হিসেবের গোড়ায় অনেক যদি-কিন্তুর ব্যাপার আছে। অর্থাৎ যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে যদি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গ্রাম অবধি পৌঁছে দেওয়া যায় যদি সেই অবধি ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিয়ে যাওয়া যায় যদি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে-ব্রাঞ্চে স্ক্যানিং-ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা যায় যদি যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত কর্মী বাহিনী তৈরি করা যায় এবং এমন আরও যদির প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তবেই এই লাভের প্রশ্ন !!

এই প্রকল্পে মোট ব্যয় নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা আছে। সরকারি হিসেবে আধার কার্ড তৈরির মোট খরচ ধরা হয়ছে ১৮,০০০কোটি টাকার মত। এদিকে বেসরকারি নানান মহল থেকে অনুমান করা হচ্ছে প্রকৃত ব্যয় এর বহুগুণ হবে। তবে বিগত বছরে কত টাকা ওই সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে তার হিসেবটা দেখলে ছবিটা কিছুটা পরিস্কার হবে। দেখা যাচ্ছে ২০১০-১১ সালে শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ইউআইডি-কে দেওয়া হয়েছিল ১৯০০কোটি টাকা। প্রকৃত খরচ অবশ্যই অনেক বেশি । ধরুন না কেন এক-একটি প্লাস্টিক কার্ড তৈরির খরচ যদি ৫০ টাকাও ধরা যায়, তাহলে ১২০ কোটি কার্ড বানাবার খরচই তো দাঁড়ায় ৬০০০কোটি টাকা ! সেখানে সরকার বলছে গোটা প্রকল্পের খরচ ১৮০০০ কোটি টাকা!! আসলে যেহেতু বেশ কয়েকটি সংস্থা এই কাজের অংশীদার তাই অনেক খরচ তাদের ঘাড় দিয়ে চলে যাবে বলে অঙ্কটা এমন ছোট করে দেখান যাচ্ছে।

যবে থেকে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা হয়েছে নানান মহল থেকে এর সমালোচনা বিরোধিতা হয়ে আসছে। এই নিয়ে লেখাপত্র মিটিং মিছিল সেমিনার বক্তৃতা চলছে। সমালোচনা এবং বিরোধিতার বিষয়গুলি সংক্ষেপে এইরকম

সমালোচনা এক : কাজের কাজ না

অনেকে বলছেন এটা কোনো কাজেই আসবে না। কারণ আমাদের মত অনগ্রসর দেশের কোনে কোনে এই ব্যবস্থার সুযোগ ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। ফলে এই প্রকল্পে এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করাটা অপচয়ের নামান্তর। এই অর্থ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় করলে উপকার বেশি হত।

সমালোচনা দুই : আইনি পদ্ধতি মেনে কাজ হচ্ছে না অনেকের অভিযোগ হল গোটা ব্যাপারটা আইনি পদ্ধতি মেনে হচ্ছেনা । কাজ শুরু হয়ে যাবার পর সরকার এখন আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা শুরু করছে! অনেক সাংসদ তাই এটাকে পার্লামেন্ট অবমাননার সামিল বলে মনে করছেন। ন্যাশানাল আইডেনটিটিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিল ২০১০ এখন পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। সেখানে নানান আপত্তি উঠেছে। বলা হচ্ছে যে সিটিজেনসশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৫ এবং সিটিজেনসশিপ (রেজিসট্রেশন অফ সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অফ ন্যাশানাল আইডেন্টিটি কার্ড) অ্যাক্ট ২০০৩ এর সাথে এই অ্যাক্টের সংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সেখানেও আইনের সংশোধন দরকার।

সমালোচনা তিন : গোপনীয়তা রক্ষার গ্যারান্টি কোথায়

তথ্যভান্ডারের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে সরকারের দেওয়া আশ্বাসে অনেকে আস্থা রাখতে পারছে না। কারণ এমন সব বিদেশি সংস্থাকে তথ্য আহরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই সন্দেহজনক। ওইসব কোম্পনীর পরিচালন গোষ্ঠীর

মধ্যে যুক্ত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা ও মিলিটারি সংস্থার প্রাক্তন কর্তাব্যক্তিরা। যেমন আঙ্গুলের ছাপ ও চোখের মণির ছবি স্ক্যানের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এল-ওয়ান আইডেনটিটি সলিউশন নামের সংস্থাকে। এই সংস্থার সাথে যুক্ত রয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র প্রাক্তন ডিরেক্টর জর্জ টেনেট এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি-র প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি অ্যাডাম জেমস লয়। এই কোম্পনীরই বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্য বি জি বেক ছিলেন আর্মি টেকনোলজি সায়েন্স বোর্ডের সদস্য। ফলে এদের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য মার্কিন মিলিটারি এবং গোয়েন্দা সংস্থার হাতে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ গোপনীয়তা রক্ষার কোনো অঙ্গীকার দেওয়া এদের পক্ষে সম্ভবই না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিয়ট ল-ই এটা হতে দেবে না। এই আইনের বলে সরকার চাইলেই দেশের যেকোনো ব্যবসায়ী সংস্থা তাদের এক্তিয়ারে থাকা সব তথ্য সরকারকে দিতে বাধ্য। এল-ওয়ান আইডেনটিটি সলিউশন ছাড়াও আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং, একসেনচুয়ারের মত একাধিক সংস্থা তথ্য ভান্ডার তৈরির কাজে নিযুক্ত। এটা আমাদের দেশের গোটা সিকিরিউটি ব্যবাস্থার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করছেন এঁরা।

সমালোচনা চার : প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ

একদল মানুষ সরাসরি এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন। বলছেন এটা জনবিরোধী উদ্যোগ। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সরকার নাগরিকদের প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করছে। আঙ্গুলের ছাপ বা চোখের মণির ছবি দিতে কখনই কেউ বাধ্য নয় । অথচ ওই ছাপ ও ছবি নিয়েই তৈরি হচ্ছে এই পরিচয়পত্র। এবং সেটাকেই সব থেকে বেশি মান্যতা দেবে বলে সরকার প্রচার করছে।

সমালোচনা পাঁচ : আসল উদ্দেশ্য নজরদারি

অনেকে বিশ্বাসই করেন না যে সরকার এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে নিছক মানুষের উপকারের জন্য। জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ থেকে দুর্নীতি দূর করার কথাটা অজুহাত মাত্র। তাঁদের আশঙ্কা যে এই বায়োমেট্রিক তথ্য ভিত্তিক পরিচয়পত্র আসলে ব্যবহার করা হবে দেশের জনসাধারণের ওপর নজরদারী করার জন্য। যাঁরাই সরকারের কাজের সমালোচনা করবে তাদের পাকড়াও করা এবং হয়রান করার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ। সরকার-বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে এই অস্ত্র ।

এমন সন্দেহ করার কারণ হল যে এই ইউআইডি প্রকল্পে আহৃত তথ্যভান্ডারকে সংযুক্ত করা হয়েছে ন্যাটগ্রিড বা ন্যাশানাল ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্কের সাথে। মানে সমস্ত তথ্যভান্ডার দেশের গোয়েন্দা সংস্থার নাগালের মধ্যে চলে গেল। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক জ্যাঁ দ্রেজ এই প্রসঙ্গে একটি লেখায় একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। বলেছেন যে আজ যদি অরুন্ধতি রায় আর একবার দাঁন্তেওয়ারায় মাওবাদী আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনার জন্য সেখানে যেতে চান এবং পরিচয়পত্র হিসেবে আধার-কার্ড ব্যবহার করে প্লেন বা ট্রেনের টিকিট কাটেন তো তাহলে এয়ারপোর্ট বা রেলস্টেশন থেকেই অনায়াসে তাঁকে তুলে নিতে পারবে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ। কারণ টিকিট কাটার সময়ই তারা জেনে যেতে পারছে যে উনি কোথায় যাচ্ছেন ।

এটি নিছকই একটা উদাহরণ। কারণ অরুন্ধতি রায়ের মত পরিচিত ব্যক্তিত্বের জন্য এতসব আয়োজনের প্রয়োজন হবার কথা নয়। কারণ যা ব্যবস্থা এখনই চালু আছে তাতে কখন তিনি কোথায় যাচ্ছেন বা কোন হোটেলে ব্রেকফাস্ট করছেন বা ডিনার করছেন, সরকার চাইলে এখনই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে খবর রাখতে পারে। হয়তো রাখেও। কারণ মোবাইল ফোন, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের সূত্র ধরে এখনই যেকোনো ব্যক্তির অবস্থানের ওপর নজরদারি করা সম্ভব। এবং করা হয়ও। শুধু অরুন্ধতি রায়ের মত উচ্চ কোটির মানুষ নয়, অতি সাধারণ লোকও আজ মোবাইল ও ব্যঙ্কের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে থাকে। এবং এদের সকলেই আজ গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারীর আওতার মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ সরকার চাইলেই তাদের ওপর নজরদারি করতে পারে। তা

না হলে ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড ও মোবাইল-টাওয়ার ট্র্যাক করে সাধারণ অপরাধীদের এমন অবলীলায় পাকড়াও করছে কিভাবে পুলিশ ?

তবে ঘাগু অপরাধীদের ধরা অত সহজ হচ্ছে না। তেমন অপরাধীরা মোবাইল কানেকশন বা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে করে না। ফলে মোবাইল-টাওয়ার ট্র্যাক করে অপরাধী পাকড়াও করলেও তাদের প্রকৃত পরিচয় নির্দ্ধারণ করতে বেশ বেগ পেতে হয় পুলিশকে। কিন্তু আগামী দিনে যদি আধার-কার্ড ভিত্তিক পরিচয়পত্রই সর্বত্র আবশ্যক করা হয় তাহলে এই সনাক্তকরণের কাজটা সহজ হয়ে যাবে। কারণ আঙ্গুলের ছাপ ও চোখের মণির ছবি স্ক্যান করে আসল পরিচয় বের করে ফেলা যাবে।

সমালোচনা ছয় : বিদেশীরাও কার্ড করিয়ে নিতে পারে

আরও একটি ব্যাপারে আশঙ্কা জ্ঞাপন করছে অনেকে । বলছে যে কার্ড করানর আগে যেভাবে তথ্য যাচাই-এর কাজ চলছে তাতে যেকেউ এই কার্ড করিয়ে নিতে পারে। কারণ তথ্য যাচাইয়ের জন্য এখনকার পরিচয়পত্রই দেখা হচ্ছে। ফলে ভূয়ো পরিচয়পত্র জোগাড় করে স্বার্থান্বেষী ভিনদেশিরাও এই ফাঁকে নতুন পরিচয়পত্র করিয়ে নিয়ে নাগরিক হিসেবে পাকা বন্দোবস্ত করে নিতে পারে।

সমালোচনা সাত : তথ্য বিদেশে পাচার হবে

বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করানো হচ্ছে। এরা নিজেদের মত করে কোনো তথ্য সংগ্রহ করছে কিনা তার ওপর নজরদারি করা হচ্ছে কিনা জানা নেই। সংগৃহীত তথ্য তারা নিজদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করছে কিনা বা সেই তথ্য অন্যত্র পাচার করছে কিনা তার গ্যারান্টি কি?

সমালোচনা আট : ত্রুটিহীন ব্যবস্থা করা অসম্ভব

আসলে কাজটা যতটা সহজ মনে করা হচ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে আদৌ অত সহজ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ যতই তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি হয়ে থাক না কেন একশো কুড়ি কোটি লোকের দেশের যেকোনো ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ ওই বিশাল তথ্যভান্ডারের তথ্যের সাথে মিলিয়ে একশো শতাংশ সঠিক জবাবটি বের করে আনা মোটেই সহজ কাজ না। ফলে পরিচয় নির্ণয়ে প্রচুর ভুল হবে। এবং এতটাই ভুল হবে যে সরকারকে হয়তো এই উদ্যোগের মহিমা সম্পর্কে বাগাড়ম্বর বন্ধ করতে হবে।

সমালোচনা নয় : ভোগান্তি হবে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের

আসলে বিপন্ন হবে সাধারণ মানুষ। যদি সত্যি সত্যি আধার-কার্ড নির্ভর পরিচয়পত্র দিয়েই সব কাজ করা হয় তাহলে আগামী দিনে বহু নিরপরাধ মানুষকে অকারণ হয়রানির শিকার হতে হবে। আজকের দিনে যেসমস্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলিতে ভুল হতে পারে এই আশঙ্কার কথা সবারই জানা। আমরাও জানি আর সরকারি দপ্তর থেকে ব্যাঙ্কের বাবু সবাই জানে সে কথা । সেজন্য এ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিলে সাধারণ মানুষের ওজর আপত্তি শুনলেও শোনা হতে পারে। কিন্তু আধার-কার্ডকে এমন একটি নিশ্ছিদ্র পাকা ব্যবস্থা বলে প্রচার করা হচ্ছে যে আগামী দিনে এই নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনো আপত্তি বা অভিযোগই অফিস আদালতের বাবুরা কানে তুলতে চাইবে না। আরও বিপদের কথা হল কোনো রকম ওজর আপত্তি যাতে কানে তুলতে না হয় সেজন্য আগাম আইনী রক্ষাকবচ রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে প্রস্তাবিত ইউনিক আইডেনটিটিফিকেশন অ্যাক্টের মধ্যে। বলা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আদালতে গ্রাহ্য হবে না! অভিযোগ বিবেচনার ভার থাকবে ইউনিক আইডেনটিটিফিকেশন অথরিটির ওপর। কিন্তু এও কি সম্ভব? এই বিশাল দেশের মানুষ কিভাবে নাগাল পাবে এই কোম্পানীর লোকেদের? ধরা যাক ৫শতাংশ পরিচয় পত্রে ত্রুটি রয়ে গেল। তার মানে ৬কোটি মানুষের পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না ! তাহলে এই ৬ কোটি মানুষ নানান কাজে ভোগান্তির শিকার হবেন। ফলে পরিচয়পত্র হিসেবে আধার-কার্ড আবশ্যিক করার আগে এই সমস্যার সমাধান খুবই জরুরি।

আবহাওয়া পরিবর্তনে বিকল্প মহাকাশীয় তত্ত্ব ঃ সত্যতা নির্ণয়ে সার্ন (CERN)-এ পরীক্ষা

কুমারেশ মিত্র

[নতুন লেখা সাধারণত আমাদের বৈঠকে পড়া হয়, লেখকের উপস্থিতি কাম্য। সেরকমভাবেই 'আবহাওয়া পরিবর্তনের' উপর বর্তমান লেখাটি নিয়ে বসেছিলাম আমরা। মহাবিতর্ক দেখা দিল সেখানে। ভূ-উষ্ণায়ণের তথা আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি? শিল্পে ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নাকি প্রাকৃতিক চক্রের দরুণ ওঠাপড়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের দায় নেই। বিতর্ক আগেও ছিলো। কিন্তু তা এত প্রবল ছিলো না, যা এখন হয়েছে। তর্কে যেমন হয়—এখানেও উঠে পড়লো রাজনীতির কথা, অর্থনীতির কথা। পেট্রোলিয়াম লবি আর তার বিরোধী লবির কথা। উঠে পড়লো বিজ্ঞানীদের পক্ষপাতের কথাও। এই লেখার লেখকের বিরুদ্ধেও বায়াস-এর অভিযোগ উঠল। উল্টে লেখকও শোনালেন ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে ভয় দেখানোর কথা।

অবশেষে একমত হওয়া গেল যে আমরা বিতর্ক করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারবো না। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারের বিভিন্ন দিক ও ইতিহাস জানা মানুষজনকে বিতর্কের মধ্যে এনে ব্যাপক আলোচনা করা উচিত হবে। আপাতত এ লেখায় একটি মত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে কি না, সেটাই বিবেচ্য। পাঠকদের কাছ থেকে এব্যাপারে প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা রইল। স: ম:]

ভূ-উষ্ণায়নের গ্রিন হাউস গ্যাস তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত; আবহাওয়া বিজ্ঞান সাহিত্যে এ নিয়ে লেখার ছড়াছড়ি। এই তত্ত্ব গত শতাব্দীর শেষ অবধি পৃথিবীর সমস্ত উন্নত পাশ্চাত্য দেশের সায়েন্স একাডেমি এবং ওয়ার্লড্ মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং ইউনাইটেড্ নেশন্স কর্তৃক গঠিত ইনটার গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট্ চেঞ্জের (আইপিসিসি) সমর্থন লাভ করেছে। প্রসঙ্গত, এই শেষোক্ত সংস্থা আই পি সি সির কাজ হল আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পৃথিবীর সমস্ত সরকার ও জনগণকে অবহিত করা। গ্রিন হাউস তত্ত্বের সমর্থক দলে অনেক বিশিষ্ট এবং বেশ কিছু নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ছিলেন এবং আছেন।

তবে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকেই বহু বিশিষ্ট এমনকি নোবেলজয়ী পদার্থবিদ, রসায়নবিদ্ আবহাওয়াবিদ্ বিজ্ঞানী ভূ-উষ্ণায়নের গ্রিন হাউস তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করেছেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যদি জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ওজোন(O_3) ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকত অর্থাৎ তাদের মাত্রা যদি শূণ্য হত, তবে বিজ্ঞানীদের গণনা অনুযায়ী ভূত্বক ও সংলগ্ন বায়ুর গড় উষ্ণতা দাঁড়াত -১৮° সেলসিয়াস। বাতাসে মনুষ্য-সৃষ্ট মূল দূষক গ্রিন হাউস গ্যাস হল CO_2। আইপিসিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী গত দশ হাজার বছরে শিল্প বিপ্লবের শুরুর সময় অবধি CO_2 এর মাত্রা ২৬০ থেকে ২৮০ পিপি এম্ ভি (পার্টস্ পার মিলিয়ন, আয়তন অনুযায়ী) এই ক্ষুদ্র পাল্লার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে এবং গ্রিন হাউস প্রভাবের দরুণ ভূত্বকের গড় তাপমাত্রা হয়েছে ১৪° সেলসিয়াস। তাহলে, CO_2-এর মাত্রা ২৮০ পিপি এম ভি বৃদ্ধির দরুন ভূ উষ্ণতার বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা যায় ৩২° সে। আইপিসিসির চতুর্থ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীতে বাতাসে CO_2-এর মাত্রা ২৮০ পি পি এম ভি থেকে প্রায় ১০০ পি পি এম ভি বৃদ্ধির ফলে ভূ-তাপমাত্রা বেড়েছে মাত্র ০.৬° সে। উষ্ণতা বৃদ্ধি নিয়ে এই দুটি তথ্যের মধ্যে সাধারণ যুক্তিতে মিল খুঁজে পাওয়া ভার! তবে আমরা জানি, পৃথিবীর আবহাওয়া ব্যবস্থায় বিকিরণ শক্তির বাজেটের ওপর বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবসম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই নিম্ন স্তরে আছে।[১]

১৯৯৮ সালের পর থেকে গড় ভূ-উষ্ণতার আর বৃদ্ধি ঘটে নি; মনুষ্য-সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়নের তত্ত্বের বিরোধিতা করে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক পেপার ছাপা হয়। উষ্ণায়ন নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু নতুন তথ্য প্রকাশিত হয় এবং আই পি পি সি-র একদল বিজ্ঞানী সহ বেশ কিছু বিজ্ঞানী উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে বিরুদ্ধে মত চারণ করতে শুরু করেন। এইসব কারণ এবং বিজ্ঞান সমাজগুলিতে বিজ্ঞানীদের খোলাখুলি বিদ্রোহ মনুষ্যসৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের প্রবক্তাদের খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ২০০৯ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আই পি সিসির কিছু বিজ্ঞানী সহ পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়া বিদ্যা, রসায়ন ও ভূ-তত্ত্বের ৬০ জনের অধিক প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেলকে চিঠি লেখেন। চিঠিতে তাঁরা চ্যান্সেলারকে জানান, বাতাসে CO_2 এর বর্তমান মাত্রায় বিকিরণ শক্তি শোষনের ক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়েছে এবং যদি পৃথিবীর সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস) পুড়িয়ে ফেলা হয় তবে ভূ-উষ্ণায়ন ১° সেলসিয়াসের কয়েক শতাংশের বেশি ছাড়িয়ে যাবে না। তাঁরা চ্যান্সেলার মার্কেলকে নিজের অবস্থান খুব দৃঢ়তা সহকারে পুনর্বিবেচনা করে একটি মতবাদ-মুক্ত নিরপেক্ষ প্যানেল গঠনের আহ্বান জানান যে প্যানেল বিজ্ঞান-সম্মত-বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা আইপিসিসি-র সঙ্গে লড়াই করবে এবং একই সঙ্গে আবহাওয়া বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে[২]।

আবার ব্রিটেনের প্রথম এবং প্রধান বিজ্ঞান সংস্থা রয়াল সোসাইটির পূর্বতন সভাপতি আবহাওয়া পরিবর্তন বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। এর ৪৩ জন বিদ্রোহী সদস্য এই বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধ মত গ্রহণ না করায় এবং মনুষ্য-সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল কারণ এই তথ্যের নিশ্চয়তার মাত্রাকে অতিশয় অতিরঞ্জিত করার দায়ে সংস্থাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ফলে, চাপে পড়ে বর্তমানে রয়াল সোসাইটি তার অবস্থানের পুনর্বিবেচনা শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই তাঁদের কর্ম-জীবন থেকে অবসর-প্রাপ্ত বলেই এটা সম্ভব হয়েছে[৩]। প্রসঙ্গত, আমেরিকার নিউ জার্সিতে প্রিন্সটনের প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ ফ্রিম্যান্ ডাইস্ন মনে করেন, বায়ুমণ্ডলে বর্তমান ঘনত্বে গ্রিন হাউস গ্যাস ভূ-উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে এই অপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল চিন ও ভারতের উন্নয়ন প্রতিহত করা[৪]। তিনি ভূ-উষ্ণায়ন আন্দোলনকে একটি ধর্মীয় আন্দোলনে হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে ভীতি সঞ্চারে আপত্তি জানিয়েছেন। নাসায় বিশেষ মেডেল প্রাপ্ত এবং আলাবামার রাজ্য আবহাওয়াবিদ্ জন্ ক্রিস্টির মতে প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীলতা এবং আবহাওয়া তন্ত্রের জটিলতাই নিজে থেকে আজকের দিনের মত উষ্ণায়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং বর্তমানের একটি প্রবণতা হল, আবহাওয়ায় কোনো কিছু ঘটলেই লাফ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যে এটি মনুষ্য-কৃত কর্মকাণ্ডের ফলেই ঘটেছে[৫]। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৭৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ডঃ আইভার গ্লেভার মনুষ্য সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্ব একদমই মেনে নেন নি এবং ২০০৯ সালে যে শতাধিক বিজ্ঞানী আবহাওয়া পরিবর্তনে প্রেসিডেন্ট ওবামার অবস্থানকে সমালোচনা করে তাঁকে যে চিঠি লেখেন, সেই চিঠিতে তিনিও একজন স্বাক্ষরকারি ছিলেন। অবশেষে ২০১১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরে মনুষ্য সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের প্রতিবাদ করে আমেরিকায় বিজ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান মর্যাদা-পূর্ণ সংস্থা আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি থেকে তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন[৬]।

আমেরিকায় পদার্থবিদ্যায় খ্যাতনামা প্রফেসর উইলিয়াম হারপার লিখেছিলেন—সমস্ত রকম সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, আবহাওয়ার বর্তমানকালীন উষ্ণায়ন ঠিক অতীতের অনেক উষ্ণায়নেরই মতো। বস্তুতঃ, এটি অতীতের মতো অতটা উষ্ণায়ন নয়। তবে খুব সম্ভবত এই উষ্ণায়নের সঙ্গে CO_2-এর কোনো সম্পর্ক নেই। হার্পার প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ্ ডব্লিউ বুশের অধীনে শক্তি দপ্তরে শক্তি গবেষণার অফিসে ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন, "আমার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে (পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নে আমার দীর্ঘ গবেষণার জীবনে যা গ্রিন হাউস প্রভাবের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল) আমি নিশ্চিত যে CO_2 নিয়ে বর্তমান কালের ভয়-ভীতি একটি ভ্রান্তি। এটা বোঝাতে তিনি ক্ষুদ্র তুষার যুগ এবং মধ্যযুগের উষ্ণ সময়-কালের দুটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন[৭]। এঁরা অবশ্য ভূ-উষ্ণায়ন বিষয়টির রাজনীতিকরণেরও নিন্দা করেছেন।

ভূ-উষ্ণায়নের একটি বিকল্প তত্ত্ব ঃ সৌর মহাকাশীয় তত্ত্ব

ভূ-উষ্ণায়ণের গ্রিন হাউস তত্ত্বকে যদি অমান্য করতে হয় তবে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ানো এর একটি বিকল্প তত্ত্ব থাকা খুবই প্রয়োজন। NASA এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপের কিছু বিজ্ঞানীর গবেষণায় পৃথিবীতে নেমে আসা সৌর শক্তির পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে ভূ-উষ্ণায়নের বিভিন্ন তত্ত্ব খাড়া হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ তত্ত্ব মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ায় পৃথিবীর ট্রোপোস্ফিয়ারের মেঘের পরিবর্তনশীলতার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে; ডেনিস পদার্থবিদ হেন্‌রিক স্বোয়েন্‌স্মার্ক এই তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেন এবং তা বৃটিশ বিজ্ঞান লেখক নাইগেল ক্যাল্‌ডারকে নিয়ে ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁদের বই "The chilling Stars : A New Theory of Climate Change' —এ লিখে ফেলেন[৮]। তাঁদের এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের কাছাকাছি অংশ থেকে বিস্ফোরণশীল সুপারনোভা আমাদের ছায়াপথে অবিরাম বুলেটের স্রোতের মত ছুঁড়ে চলেছে মহাজাগতিক রশ্মি সমূহ—প্রোটন, আলফা কণা (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস), ইলেকট্রন ও মিউ-অন্ (ভারী ইলেক্‌ট্রন)। এই কণাগুলি পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডল ট্রোপোস্ফিয়ারে পৌঁছে বাতাসের অনু পরমাণু থেকে সংঘাতে ইলেকট্রন ছিটকে দিয়ে বাতাসকে আয়নিত করে দেয়। তত্ত্ব অনুযায়ী মুক্ত ইলেকট্রনগুলি 'মেঘ ঘনীভবন কেন্দ্র' গঠন করে মেঘ সৃষ্টির বীজ হিসাবে কাজ করে। বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্প ঘনীভবন কেন্দ্রগুলির উপর ঘনীভূত হয়ে মেঘের জলকণার সৃষ্টি করে। এই মেঘের কলেবর যত দীর্ঘ হবে, তত বেশি পরিমাণ সৌরালোককে মেঘ প্রতিফলিত করে মহাকাশে ফিরিয়ে দেবে এবং পৃথিবী তত বেশি শীতল হয়ে পড়বে। ২০০৬ সালে স্বোয়েন্‌স্মার্ক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ তাঁদের তৈরী মেঘ ঘনীভবন কেন্দ্রগুলিতে অল্প সালফিউরিক অ্যাসিড্ যোগ করে পরীক্ষার সাহায্যে দেখান কিভাবে মেঘ সৃষ্টি করা যায়। মূলতঃ অতিক্ষুদ্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন এবং খুবই অল্পাংশে আগ্নেয়গিরি এবং জীবাশ্ম জ্বালানির দহন বাতাসে মেঘ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সালফারের স্টক অবিরামভাবে রক্ষা করে চলে।

সৌর ঝড়ের সময় সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্র এর গ্রহগুলি অবধি ছড়িয়ে পড়ে এবং বিস্ফোরণশীল সুপারনোভা থেকে প্রচণ্ড গতিতে আমাদের দিকে ধাবমান মহাজাগতিক রশ্মির বেশ ভালো অংশকে মহাকাশে তাড়িয়ে দেয়। সান্‌স্পট্‌স্ বা সৌর কলঙ্কগুলিতে (৪০০০-৪৫০০° কেলভিন) বিপুল চৌম্বক ক্ষেত্র বিরাজমান থাকে বলে টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে তাদের উজ্জ্বল সূর্য-পৃষ্ঠের (৬০০০°কে) তুলনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেই প্রতীয়মান হয়। রেকর্ডে যে দশটি ১১ বছরের তীব্রতম সৌরচক্রের সন্ধান পাওয়া যায় তার পাঁচটিই গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ঘটেছে। তাই এই শতাব্দীতে সূর্য বক্ষে প্রচুর সৌর কলঙ্কের আনাগোনা এবং সূর্যের নিজস্ব চৌম্বক ঢাল দ্বিগুণেরও বেশি শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায়, চৌম্বক বিতাড়নের কারণে আপেক্ষিকভাবে কম পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছোয়। ফলে ঘনীভবন কেন্দ্র ও বাতাসে মেঘের পরিমাণ হ্রাস পায়, অনেক বেশি সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। প্রসঙ্গত ঃ মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ায় সৃষ্ট মেঘের পরিমাণ পার্থিব প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ঘণীভবন কেন্দ্র ঘিরে উৎপন্ন মেঘের তুলনায় সামান্য, কিন্তু তা ভূ-তাপমাত্রা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করে।

যখন সূর্য তার চৌম্বক ক্রিয়াশীলতা হারিয়ে শান্ত হয়ে পড়ে এবং সৌর কলঙ্কের সংখ্যা অনেক কমে যায়, তখন মহাজাগতিক রশ্মি প্রায় নির্বাধায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ মেঘের সৃষ্টি করে, পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের হ্যাড্‌লি সেন্টার এবং উপগ্রহ তথ্য থেকে ভূ-তাপমাত্রা মাপার নায়ক বিজ্ঞানী জন ক্রিস্টি সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এবং বি-বি-সির মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-মাধ্যমের অভিমত অনুযায়ী ১৯৯৮ সাল থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে — কখনও কমেছে, কখনও বেড়েছে, যদিও এই পরিসর সময়ে বাতাসে শিল্প জাত কার্বন নিঃসরণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এই সময় সূর্যও খুব শান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই মনে হয়, আবহাওয়া পরিবর্তনের সৌর/মহাজাগতিক রশ্মি তত্ত্ব ভূ-উষ্ণায়ন থেমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে। বস্তুতঃ, এই তত্ত্ব টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর থেকে গত ৪০০ বছরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

সৌর/মহাজাগতিক রশ্মি তত্ত্ব ভূ-তাত্বিক সময় স্কেলে

আবহাওয়া পরিবর্তনেরও ব্যাখ্যা করতে পারে। আমাদের ছায়াপথ স্থিত নক্ষত্র মণ্ডলির কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সৌর জগৎ প্রতি ১৩.৫ কোটি বছর অন্তর অন্তর ছায়াপথের কুণ্ডলিকৃত বাহুগুলির (Spiral arms) একটির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায় যেগুলির মধ্যে উচ্চ মাত্রার মহা জাগতিক রশ্মি থাকে। নভো—পদার্থবিদ নির সাভিভ এবং ভূতত্ত্ব-বিদ জ্যান্ ভাইজার্ দেখিয়েছেন যে গত ৫০ কোটি বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা ছায়াপথে সৌর জগতের যাত্রা পথের প্রতিটি স্থানে, বিশেষত যখন তা কুণ্ডলিকৃত বাহুর মধ্যে প্রবেশ করে বা তা থেকে বেরিয়ে যায় সেই সময়ে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়া মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রার সঙ্গে খুব সু-সম্পর্কিত থাকে। তাঁরা আরও দেখেছেন, কোনো একটি সময়ে বাতাসে CO_2 এর মাত্রা বর্তমানের তুলনায় ১৮ গুণ বেশি ছিল এবং আজ থেকে প্রায় ৪৫ কোটি বছর আগে পৃথিবী যখন সম্পূর্ণভাবে বরফে ঢাকা ছিল, বায়ু মণ্ডলে CO_2 এর মাত্রা ছিল এখনকার চেয়ে ৯ গুণ বেশি।[৮]

তত্ত্বের সত্যতা নিরুপণে CERN -এ পরীক্ষা

১৯৯৫ সালের ডেনিস পদার্থবিদ হেন্‌রিক স্বোয়েন্‌স্মার্ক , এইগিল ফ্রিস্ ক্রিসেনসেন এবং কুন্ড ল্যাসেনের ১৯৯১ সালের গবেষণা পত্রটি পড়েন যেখানে ১৮৬০ সাল থেকে সৌর পরিবর্তনশীলতা ও ভূত্বকের উষ্ণতার মধ্যের গভীর সম্পর্ক লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু স্বোয়েন্‌স্মার্ক মনে করেছিলেন, মেঘের আবরণ ও মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক বিরাজ করে। তিনি উপগ্রহ প্রদত্ত তথ্য নিয়ে সৌর ক্রিয়াশীলতা, মেঘের আবরণ এবং মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে গভীর আন্তঃ-সম্পর্ক অধ্যয়ন করার জন্য ডেনিস ন্যাশান্যাল্ স্পেস্ ইনস্টিটিউটে সূর্য ও আবহাওয়া নিয়ে গবেষণায় নেতৃত্ব দেন এবং ধারণা করেন, ভূ-উষ্ণায়নের অধিকাংশের জন্য দায়ী মহাজাগতিক রশ্মি ও সূর্য, মানুষের ক্রিয়া-কর্ম নয়।

স্বোয়েন্‌স্মার্কের বইয়ের সহ-লেখক বৃটিশ বিজ্ঞান সাংবাদিক নাইগেল ক্যাল্‌ডার্ অভিযোগ করেন যে রাষ্ট্র সঙ্ঘ-সৃষ্ট আই পি সি সি স্বোয়ন্‌স্মার্ক দলের গবেষণার খরচ বহন করতে অস্বীকার করেছে।[৯] তবুও ডেনিসরা ১৯৯৬ সালেই তাঁদের গবেষণার প্রাথমিক ফল হিসাবে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম শহরে সাংবাদিক বৈঠক করে মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে মেঘের (শৃঙ্খল) সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেন। আই পি সি সি-র চেয়ারম্যান বার্ট বোলিন এর উত্তরে বলেন, ওঁদের ঘোষণা হাস্যকর সারল্যে পূর্ণ এবং দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জিত।[১০] ভূ-উষ্ণায়ন বিষয়টির এত দ্রুত রাজনীতি-করণ করা হয় যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর বিজ্ঞান ও সরকারি নীতি সমূহ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কখনই খোলাখুলি ও পরিপূর্ণ বিতর্ক করা সম্ভব হয় নি। সব সময় বলা হয়েছে, ভূ-উষ্ণায়ণের বিজ্ঞান ও নীতি নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে, এই বিতর্ক সবে শুরু হয়েছে। যে সব বিজ্ঞানী মনুষ্য সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্ব বিরোধী বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাদের ওপর নানা ভাবে নিপীড়ন করা হয়েছে। এমন কি তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে তাঁরা রেহাই পান নি। 'Sceptical Science' ম্যাগাজিনের লেখায় নোবেলজয়ী ডঃ আইভার গ্লোভার ও সমচিন্তার অন্যান্যদের পরিণতি উদাহরণ যোগ্য। এমন কি বিজ্ঞান গবেষণায় যথেষ্ট পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও ডেনিস পদার্থবিদদের গালাগালি করে গুরুত্বহীন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, গবেষণার ফাণ্ড কেটে দেওয়া হয়েছে'। ইউরোপিয় (সদস্য দেশসংখ্যা ২০) নিউক্লিও গবেষণার প্রতিষ্ঠান CERN -এ পূর্ণ ও আংশিক সময় মিলিয়ে কর্মী সংখ্যা প্রায় ৮০০০; এছাড়া বিশ্বের ৬০৮টি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রায় ১০,০০০ অতিথি বিজ্ঞানীরা এখানে কাজ করেন। সুইজারল্যান্ডে জেনেভার কাছে CERN -এর সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে পদার্থবিদরা সৌর মহাজাগতিক রশ্মি তত্ত্বকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁরাও এই প্রকল্পের কাজ মাঝে মাঝেই বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই এই প্রাথমিক পরীক্ষা CERN -এ সম্পন্ন করতে দীর্ঘ ১৪ বছর সময় লেগেছে।

নাইগেল ক্যাল্‌ডার CERN -এ ১৫ বছর আগে মহাজাগতিক রশ্মি ও মেঘাচ্ছন্নতা নিয়ে স্বোয়েন্‌স্মার্কের আবিষ্কার সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এটি CERN- এর বিজ্ঞানী জেসপার কির্কবির কৌতুহল উদ্রেক করেছিল। তাঁর 'CLOUD' নামক গবেষণা প্রস্তাব তৈরীতে অংশ -গ্রহণকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্যাল্‌ডার ও

স্বোয়েন্‌স্‌মার্কও ছিলেন, 'CLOUD' পরীক্ষার পুরো নাম Cosmics Leaving Outdoor Droplets.[১০]

এই পরীক্ষায় ১৭টি ইউরোপিয় ও আমেরিকান ইনস্টিটিউট থেকে—৬৩ জন CERN বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। একটি স্টেন্‌লেস স্টিলের চেম্বার তৈরী করা হয়েছিল। এই দলটি চেম্বারটিকে অতি বিশুদ্ধ বাতাস এবং জলীয় বাষ্প, সালফার ডাই-অক্সাইড, ওজোন ও অ্যামোনিয়ার মত রাসায়নিক (যাদের মনে করা হয় মেঘ বপন করতে পারে) দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন; ফলত, এর মধ্যে নিখুঁতভাবে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল নতুন করে তৈরী হয়েছিল। CERN-এ রক্ষিত যে কণা ত্বরক পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কণা-চূর্ণকারি Large Hadron Collider কে রসদ জোগায়, সেই ত্বরক থেকে নিঃসৃত মহাকাশ রশ্মি-রূপী উচ্চ শক্তির প্রোটন কণা দিয়ে তাঁরা তৈরী করা কৃত্রিম বায়ুমণ্ডলে জোরালো সংঘাত ঘটান। এইভাবে যখন মনুষ্য-সৃষ্ট মহাজাগতিক রশ্মি (প্রোটন) বায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া করে, তখন গবেষক দলটি, রশ্মি বাতাসে কি প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা দেখার জন্যে কৃত্রিম বায়ু মণ্ডলের নমুনা-পরীক্ষা করেন। এর প্রাথমিক ফলাফল এই ইঙ্গিত দেয় যে, মহাজাগতিক রশ্মি অবশ্যই একটি পরিবর্তন ঘটায়। উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন প্রোটন গ্যাসিয় বায়ুমণ্ডল থেকে ন্যানো মিটার দৈর্ঘ্যের ১০ গুণের বেশি কণা উৎপন্ন করে বলে মনে হয়। বিতর্কে দুদিকে থাকা বিজ্ঞানীরাই এই ফলাফলকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন, যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত টেনেছেন।[১১]

তবু Nature News -এ (২৪ শে আগষ্ট, ২০১১) লেখা হয়েছে, CERN-ঐ পরীক্ষায় একটা সাময়িক সাক্ষ্য পাওয়া গেছে যে দূর মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করতে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।[১১]

CERN-এ পরীক্ষার মূল হোতা বিজ্ঞানী কির্কবি খুবই সতর্ক এবং আশা প্রকাশ করেছেন, আগামী দিনে আরও বড় আকারের কণা নিয়ে তাঁদের তৈরী চেম্বারে পরীক্ষা নিরীক্ষা মেঘগঠনে মহাজাগতিক রশ্মির প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান ঘটাবে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় নানান পরিমাপ সম্পন্ন করতে অন্ততঃ পাঁচ বছর সময় লাগবে।[১১] নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মূল প্রাথমিক পরীক্ষাটিই সম্পন্ন করতে ১৪ বছর সময় লেগে গেছে। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষাটি যদি আরও পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় তবে ভূ-উষ্ণায়ণ নিয়ে ওয়াকিবহাল পৃথিবীর আপামর জনগণ খুবই খুশি হবে।

তবে ২০১১ সালের জুলাই মাসেই CERN-এর ডিরেক্টর জোনারেল, CLOUD গবেষণা দলটির রিপোর্ট রাজনৈতিকভাবে সঠিক হতে হবে বলে একটি নিদারুণ বিতর্কের সৃষ্টি করে দেন। তাঁর কথার অর্থ হল, রিপোর্টটি কোনো মতেই হেন্‌রিক স্বোয়েন্‌স্‌মার্কের তত্ত্বে সমর্থন যোগাবে না[১০]। তাঁর আরও কথা, তিনি তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন পরীক্ষার ফলাফল সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করতে, তাদের ব্যাখ্যা যেন না করা হয়। তা না হলে তাঁর মতে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তন বিতর্কের উচ্চ রাজনৈতিক এলাকায় পৌঁছে যাবে। এর অর্থ হল ডিরেক্টর জেনারেল জনসাধারণের কাছে পরীক্ষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করেছিলেন[৫]।

পরিশেষে, আমরা যদি ঐ Nature পত্রিকায় প্রকাশিত কির্বি ও অন্যান্যদের মূল CLOUD পেপারটা খুব সতর্কভাবে পড়ি, তবে নিচের খুবই তাৎপর্য-পূর্ণ অংশটা নিশ্চয়ই চোখে পড়বে ঃ

"Ion-indnced nucleation will manifest itself as a steady production of new particles that is difficult to isolate in the atmospheric observations because of other sources of variability but is nevertheless taking place and could be quite large when averaged globally over the troposphere"[১২]

অর্থাৎ মহাজাগরিক রশ্মির প্রভাবে ট্রোপোস্ফিয়ারে মেঘ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল সংখ্যক ঘনীভবন কেন্দ্র (যাদের সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ) তৈরী হচ্ছে। ডেনিস পদদার্থবিদরা যা বলেছেন এতো তারই সমৃদ্ধ প্রতিধ্বনি। তাছাড়া ডেনিসদের পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষ-জনক এবং CERN-এর আরও বিস্তীর্ণ ফলাফল তুলনায় খুবই উৎকৃষ্ট। তবে মেঘ গঠনের প্রশ্নে CERN-এর পরীক্ষা একটি প্রথম পদক্ষেপ। মেঘ গঠনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান ঘটাতে CERN -এ আরও বড় আকারের কণা পরীক্ষা করতে

হবে; বিশেষতঃ বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে মহাজাগতিক রশ্মি কি অংশ নিতে পারে তা নিয়েও গবেষণা করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ ভূ- উষ্ণায়নের মহাজাগতিক কারণ ছাড়া অন্যান্য কারণও আমাদের বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। তাহলে এখন বিতর্কটা কোথায়? ভূ-উষ্ণায়নের কারণ প্রাকৃতিক চক্র-জাত নাকি মনুষ্য-সৃষ্ট— তা নিয়ে আমেরিকা দ্বিধা-বিভক্ত। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ধরে নেওয়া হয়, এটি মনুষ্য-সৃষ্ট। তবেই গবেষণার ফান্ড মেলে। সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, ভূ-উষ্ণায়ন বিষয়টির এত বেশি রাজনীতি-করণ ঘটেছে যে ওপরের প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে খুব সতর্কতার সঙ্গে গভীরভাবে ভূ-উষ্ণায়নের বিষয়গুলি, মূলতঃ এর বিজ্ঞান ও ইতিহাস - অনুধাবন করতে হবে। সে আরেক নিবন্ধের বিষয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Global Warming and Climate Change : a Scientific Inquiry and Reality Check-by Refique Ahmed, University of Wisconsin La Crosse. Meridian. aag. org/ Callorpapers/Program/ Abstract Detail. clm? Abstract ID = 48497

২। http ://www.speroforum.com/a/20054/ german-scientists-reject-manmade-global-warming

৩। http ://www.americrnothinker.com/2011/ 11/scientists_in_revolt_against_global_warming

৪। http://www.hytimes.com/2009/03/ 29magazine/29dyson-/html?-r=18page wanted = a11

৫। http://www.sceptical science.com/climate-myths-at the_US_Hearing-on-climate-change.html

৬। Nobel prize winning physicist resigns over global warming. http://boxhews.com/ scitech/2001/09/14/nobel-prize-wining-physicist-resigns-from-top physics group over global/....

৭। Professor denies global warming theory-by Raymond Brusca, http:// www.dailyprincetonian. com/2009/01/12/22506

৮। Solar and celestial causes of Global Warming by P.W. Miller

http://www.prison planet.com/march 2007/ 160307. solar.html

৯। A Solar Theory of Global Warming casts Doubt on manmade Global Warming by Raymond Richman, 31.08.2011 http://www.ideal taxes.com/part 3425.shtml

১০। Cosmic Rays Influence Cloud Seeds watts up with that.com/2011/08/24/breaking-news-cern-experiment-confirms-cosmic-rays-influence-climate-change

১১। Cloud formation may be linked to Cosmic rays : Nature News, Published on line, 24 August, 2011

১২। Role of sulphnric acid, ammonia and galactic cosmic rays in atmospheric aerosol nucleation by J. Kirkby & 62 others, Nature, Vol. 476 Issne 7365 pp 428-433 (Aug., 2011)

ওবামার দ্বিতীয় দফা : পরিবেশ নীতি

প্রদীপ দত্ত

[গোটা পৃথিবীতেই ভূ-উষ্ণায়নের রাজনীতি-অর্থনীতির ছায়া। তারই এক নমুনা তুলে ধরেছে এই লেখা —স: ম:]

মাত্র ৪০ শতাংশ সাদা মানুষের ভোট পেয়ে বরাক ওবামার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন এক অবাক কান্ড। বিশেষত যেখানে মিট রোমানির হয়ে প্রচারে সে দেশের শক্তি শিল্প তেড়েফুড়ে নেমে পড়েছিল। সাধারণভাবে রিপাবলিকান রাজনীতিকরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সন্দিহান। তেল, গ্যাস ও কয়লা শিল্পের সঙ্গে তাঁদের আঁতাত বেশি। তাই নির্বাচনের সময় বায়ু ও সৌর বিদ্যুতের প্রোডাকশন ট্যাক্স ক্রেডিট বা পিটিসি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। তারা ক্লিন এনার্জি বা বিকল্প শক্তি উৎপাদনে পিটিসি'র মতো সুবিধে দেওয়ার বিরোধী। তাঁদের কথা, পিটিসির মেয়াদ এ বছরের মতো শেষ হলে তা আর নতুন করে চালু করা চলবে না। রিপাবলিকান রোমানিরও বক্তব্য তাই।

তাই তেল, গ্যাস ও কয়লা শিল্পের কর্তারা নির্বাচনে ওবামাকে হারাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা চান জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ুক। ওমাবার ক্লিন এনার্জি কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁরা টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে নয়া আইন, কানাডা থেকে তেলের জন্য কিস্টোন পাইপলাইন বসানোর কাজে দেরী ইত্যাদির কড়া সমালোচনা করেছেন। তেল কোম্পানির পয়সায় তৈরি 'আমেরিকান এনার্জি অ্যালায়েন্স' বিজ্ঞাপনে বলেছে ওবামা প্রেসিডেন্ট হবার পর থেকে গ্যাসের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, ওবামাকে বলুন অকেজো শক্তি নীতি আর চলবে না। কয়লা এবং তেলের ব্যবহার ও গ্যাস ড্রিলিং আরও বাড়ানোর জন্য প্রচারে এবং বিকল্প শক্তিকে আক্রমণ করে টিভিতে বিজ্ঞাপন দিতে ভোটের দুমাস আগে পর্যন্ত খরচ হয়েছে ১৫.৩ কোটি ডলার। অন্যদিকে ক্লিন এনার্জির প্রসার, উষ্ণায়ন ও বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ওবামার নীতির পক্ষে প্রচারে একই সময়ে খরচ হয়েছে মাত্র ৪.১ কোটি ডলার। কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির পরই সবচেয়ে বেশি কথা হয়েছে শক্তি নিয়ে।

আগের বার, ২০০৮ সালের ভোটে, জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় সবুজ বিজ্ঞাপন ছিল বেশি। দ্বিতীয়টিতে ১৫.২ কোটি, অন্যটিতে ১০.১ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছিল। সেবার আল গোরে সমর্থিত 'অ্যালায়েন্স ফর ক্লাইমেট প্রোটেকশন' ৩.২ কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, উষ্ণায়ন থামাতে আইন প্রণয়ন করা দরকার। ওই সংগঠন নাম পরিবর্তন করে এখন হয়েছে ক্লাইমেট রিয়েলিটি প্রজেক্ট। এ বছর নির্বাচনে তারা বিজ্ঞাপনের জন্য একেবারেই খরচ করেনি। খরচ না করার কারণ, জীবাশ্ম জ্বালানি মহলের অর্থের তোড়ে তাদের ঢালা অর্থ ধুয়েমুছে যেত। প্রথম দফার শাসনে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের জন্য ওবামার আইন তৈরির উদ্যোগ সফল হয়নি। অন্যদিকে গ্যাসোলিনের ঊর্ধ্বমুখী মূল্য নিয়ে মার্কিন জনতা অখুশী ছিল।

রোমানি কথা দিয়েছিলেন, বিপুল পরিমাণ সরকারি জমি ও উপকূল এলাকায় ড্রিলিং-এর জন্য অনুমতি দেবেন, বায়ু ও সৌর বিদ্যুতের পিটিসি বন্ধ করে দেবেন, কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিরুৎসাহিত করতে যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে রাশ টানবেন। তাই জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্প রোমানির পক্ষে উদার হস্তে অর্থ ঢেলেছে। গ্যাস কোম্পানির মদতে তৈরি আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট ব্যয় করেছে সবচেয়ে বেশি। তাদের প্রচারের মূল ক্যাপশন ছিল, 'আই অ্যাম অ্যান এনার্জি ভোটার'। তারা রোমানি ও রিপাবলিকানদের নীতিগত অবস্থানের সমর্থক। ড্রিলিং কমাতে আইন এবং তেল শিল্পে ভর্তুকি বন্ধ করার জন্য ওবামার ঘোষণা দুইয়েরই নিন্দা করেছে তারা। ভোটের আড়াই মাস আগে পর্যন্ত টিভি বিজ্ঞাপন বাবদ প্রায় ৩.৭ কোটি ডলার খরচ করেছে।

একইভাবে আমেরিকান এনার্জি অ্যালায়েন্সের মতে, প্রেসিডেন্ট ওবামা কার্যত আমেরিকার ভূমি ও উপকূলে শক্তি উৎপাদন বন্ধ করতে চলেছেন। ওবামাকে হারাতে টিভি ও অন্যান্য বিজ্ঞাপনে তারা ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে। কয়েক ডজন সংস্থা ও কোম্পানি বেশি বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন করার স্বপক্ষে প্রচার করেছে; ওবামা প্রশাসনের নিন্দা করেছে। নির্বাচনী প্রচারের জন্য এদের কাছ থেকে রোমানি অন্তত ১৩০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। ওবামা পেয়েছেন মাত্র ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। আর সবুজ শিল্প থেকে পেয়েছেন মাত্র ৭৮ হাজার ডলার। ফলে প্রচারের কাজে টাকার অঙ্কের বিরাট তফাৎ রয়েই গিয়েছিল।

প্লেট প্রতি ৫০ হাজার ডলার মূল্যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন রোমানি অগস্ট মাসে। সে সময় তেল ও গ্যাস কোম্পানির কর্তারা তাঁকে বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পে আইনের বাঁধন কম করা চাই, সরকারি জমিতে আরও বেশি তেল ও গ্যাসের জন্য ড্রিলিং করার অনুমতিও চাই।

এতসবের পরও শেষ রক্ষা হয়নি, রোমানি হেরেছেন। বিশ্লেষকেরা তার নানা কারণের কথা বলেছেন। তবে একটি কারণ হল, ৭০ ভাগ মার্কিন নাগরিক মনে করেন বিকল্প শক্তিকে সরকারের সাহায্য করা দরকার। বায়ু ও সৌর শক্তি এরই মধ্যে সে দেশে মূল স্রোতের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ওবামার আমলেই স্মার্ট গ্রিড, শক্তির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তি চাহিদার ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সে দেশে জলবিদ্যুৎসহ বিকল্প থেকে এখন শতকরা ১৪.৩ ভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। ২০১১ সালেই তা শতাধিক পরমাণু চুল্লিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে ছাপিয়ে গিয়েছে। অথচ রিপাবলিকানদের বিরোধীতায় আজও বিকল্প শক্তি নীতি বা কার্বন নীতি গড়ে ওঠেনি।

এমন সময় ওবামা জিতলেন যখন জেতা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। এখনও যদি গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে আমেরিকা গরজ না দেখায়, নানা দেশকে নিয়ে নতুন উদ্যোগ গড়ে না তোলে, এ সুযোগ আর ফিরে আসবে না। গতবার ওয়াক্সম্যান-মার্কে বিলের মাধ্যমে আমেরিকার কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বিলটি কংগ্রেসের অনুমোদন পেলেও রিপাবলিকানদের বিরোধিতায় সেনেটের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। পৃথিবীর কাছে আমেরিকার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হলে নিঃসরণ কমানোর উদ্দেশ্যে বিল পাশ করাতেই হবে। এখন সময় কার্বন নিঃসরণ কমানোর কাজে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার।

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	পি ২৫২, লেক টাউন, ব্লক এ কলকাতা ৭০০ ০৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা ৭০০ ০৮৯
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে শান্তি আর্ট প্রিন্টার্স কলকাতা ৭০০ ০১২

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার

প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

মার্কিন দেশে স্যান্ডি ঝড়

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

[ভূ-উষ্ণায়ন মনুষ্য-সৃষ্ট না প্রাকৃতিক, নাকি দুই-ই? জট ছাড়াতে অনেকদিন লেগে যাবে মনে হয়। আপাতত বোধহয় চলবে লবির লড়াই। বিজ্ঞানীরাও কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লবিতে সামিল? —স: ম:]

উন্নত মার্কিন দেশে কয়েক দিনের ঝড়ে বিপর্যয় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি আবার সামনে আনলো। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা এমন এক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ যে তা বিজ্ঞান ছাপিয়ে রাজনীতির আঙিনায় পা ফেলেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই বিতর্ক ঘুরিয়ে অন্য একটি প্রচ্ছন্ন সত্যকে প্রকাশ্য করলো— আজকের দিনের বড় মাপের বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল ব্যবসায়ীদের মুনাফায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই ব্যবসায়ী বৃন্দ তাদের মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য জনমন গঠন করে, প্রভাবিত করে এবং তার জন্য "বৈজ্ঞানিকতা"র ছদ্মবেশ ধারণ করে।

বিশ্ব উষ্ণায়ণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে এই রাজনৈতিক খেলা চলছে বেশ কয়েক দশক ধরে। দু-দল যুযুধান ব্যবসায়ির লবি বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে নিজেদের মতো করে ছেঁটে নিয়ে বিতর্কটিকে নিজেদের কোলে ঝোল টানার কাজে ব্যবহার করছেন। কার্বন লবি দেখাচ্ছেন নিউক্লিয়ার লবির বিকিরণের দিক, নিউক্লিয়ার লবি দেখাচ্ছেন কার্বন নির্গমনের ফলে উষ্ণায়ণ জনিত বিপদের দিক! সত্য চলে যাচ্ছে অন্তরালে।

সাম্প্রতিক স্যান্ডি ঝড় নিয়ে সেই একই খেলা দেখা গেলো। একদল ব্যবসায়িক লবি বললেন এই ঝড় ভূ-উষ্ণায়ণের জন্যই হয়েছে-অতএব এই ঝড়ের কারণ প্রাকৃতিক নয়, কার্বন-লবির তৈরি, অতএব ঝড়ের জন্য আমাদের ঘর-বাড়ি ভাঙলো, ব্যবসার ক্ষতি হলো, স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ রইলো, আমাদের ক্ষতিপূরণ চাই! অন্যদল (যারা মূলত বীমার ব্যবসা করে) তারা বললো স্যান্ডি-মাত্রা ঝড়ের কারণ কখনও একটা হয়না, যখন ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে কোনও কথা শোনা যায়নি, তখনও মার্কিন দেশ সহ সারা পৃথিবীতে নিয়মিত বিধ্বংসী ঝড় আসতো এবং আসে। এটা নেহাতই ঋতু-পরিবর্তন চক্রের সঙ্গে যুক্ত একান্তই প্রাকৃতিক ঘটনা। এর জন্য কেউই দায়ী নয়। বীমা কোম্পানি তো বলেই দিয়েছে " Natural Calamity, Act of God" -এর জন্য ঘটা ঘটনার জন্য বীমা গ্রাহ্য নয়!

এই দুই ধারণার মধ্যে আংশিক সত্য লুকিয়ে রয়েছে। বৌদ্ধিক স্তরে ঘটমান কোন কিছুই "এক কারণ, এক ফল" এই সরল প্রকল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন জটিল ঘটনার পেছনে কার্য-কারণ-শৃঙ্খল কাজ করে। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক সত্য এই বিতর্কে একদমই আলোচিত হচ্ছে না, তা হলো ভূ-উষ্ণায়নের কারণে স্যান্ডির-র মতো ঝড়-এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে, ঝড়ের প্রবণতাও বাড়তে পারে। গড় দশ-পনের বছরের ঝড়ের প্রবণতা, গতিপথ, তীব্রতা এবং বিধ্বংসী ক্ষমতা বিচার করে একথা মানার পেছনে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে যে তাপমাত্রার অসামঞ্জস্য-র একটি প্রভাব এই ঝড়ের উৎস নির্মাণে ক্রিয়াশীল থেকেছে। মার্কিনদেশে আছড়ে পড়া ঝড়ের গতিপথ দেখাচ্ছে ভূ-উষ্ণায়ন সমতাপমাত্রা রেখার (আইসোথার্ম) বিন্যাস এবং ঝড়ের গতিপথ এবং তীব্রতা রাশিবিজ্ঞান সম্মত অর্থে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

ভূ-উষ্ণায়ণ -সংক্রান্ত পরিমাপের জন্য যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ অষ্টপ্রহর পরিমাপ চালাচ্ছে, স্যান্ডি ঘটার আগে এবং পরের পরিমাপ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এই সমস্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, স্যান্ডি ঝড়টি তার তীব্র রূপ পরিগ্রহ করেছে কারণ তা মার্কিন সমুদ্র উপকূলের উত্তর বরাবর গতিপথ বজায় রেখেছে, যেখানে সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা গত পাঁচ দশকে বেড়ে গেছে এবং বছরের এই সময়ে সমুদ্রের ঐ অঞ্চলে যে তাপমাত্রা থাকার কথা, বর্তমান তাপমাত্রা তার চেয়ে বেশি। এই বাড়তি তাপমাত্রা ঝড়টিকে বাড়তি গতিশক্তির যোগান দিয়েছে। এই ঝড়ের

তীব্রতা আরও বেড়েছে কারণ দক্ষিণ থেকে কানাডার দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহ পূর্ব মার্কিন দেশে হাজির হয়েছে। আটলান্টিক থেকে আসা উষ্ণবায়ুর সঙ্গে এই শীতলবায়ু মিল খেয়ে তাপীয় সাম্যবস্থায় উপনীত হওয়ার সময় বাড়তি তাপশক্তি ঝড়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে—ফলে ঝড়ের ব্যাস ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই ঠাণ্ডা-গরম হাওয়ার টানা-পোড়েন নিঃসন্দেহেই একটি চক্রাকার প্রাকৃতিক ঘটনা, ঋতু পরিবর্তনের মতোই। উত্তর আটলান্টিক এবং দক্ষিণ আর্কটিক মহাসাগর অঞ্চল থেকে উদ্ভুত এই ঠাণ্ডা হাওয়ার এবং সঙ্গে উচ্চ চাপ ক্রমশ প্রশমিত এবং উদ্বুদ্ধ হতে থাকে—ঘড়ির দোলকের মতো। কিন্তু ভূ-উষ্ণায়নের ফলে এই ছন্দোবদ্ধ দোলন হয়ে পড়েছে লাগামছাড়া, বেতাল। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রীষ্মকালে আর্কটিক অঞ্চলে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বরফ গলে যাচ্ছে, তাই ঠাণ্ডা হাওয়ার আর্কটিক প্রবাহটি উচ্চচাপ অঞ্চলকে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী রাখতে পারছে, দোলনের চলন পথ বাড়ছে, বাড়ছে শক্তি নিঃস্বরণের তীব্রতা, যার একটি ফল হলো স্যান্ডি।

কেরেন ট্রেনবার্থ, যিনি মার্কিন দেশের জাতীয় আবহাওয়া গবেষণা সংস্থার একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, ২০০৭ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে মার্কিন উপকূলে স্যান্ডির মতো একটি ঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তাঁর চিত্রিত সম্ভাব্য ঝড়ের গতিপথ, তীব্রতা এবং ব্যস বৃদ্ধির হার বাস্তবে ঘটা স্যান্ডির সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে গেছে। বিজ্ঞানী কেরেন-এর এই ভবিষ্যৎ বাণীর পেছনে ভূ-উষ্ণায়ণ সংক্রান্ত পরিমাপ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ২০১০ সালে মার্কিন কুলীন বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধ পত্রিকা, প্রসিডিংস অফ ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এ প্রায় ২৫ জন বিজ্ঞানীর এক যৌথ গবেষণাপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে,—"বৃহৎ বৃহৎ সাইক্লোনগুলো উষ্ণ আবহাওয়া দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাপমাত্রার সৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির বিষয়টি আমরা অসংখ্য রাশিবিজ্ঞান সম্মত সূচকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কিত করতে সক্ষম হয়েছি। ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির ঘটনার কম্পাঙ্ক বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা ১৯২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে বলে আমাদের অনুমান।"

সবশেষে আমরা জেমস হানসেনকে উদ্ধৃত করি (মনে রাখতে হবে এই বিজ্ঞানী-র আবহাওয়া বিজ্ঞান চর্চা কম্পিউটার মারফৎ নয়, প্রত্যক্ষ পরিমাপ ভিত্তিক) :

"আমাদের বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে ভূ-উষ্ণায়ন আবহাওয়ার চূড়ান্ত ক্ষ্যাপামীর জন্ম দেবে এমন বিবৃতি দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আমাদের বিশ্লেষণ (যা কিনা গত ৬০ বছরের প্রত্যক্ষ পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য-র ওপর প্রতিষ্ঠিত— লেখক) স্পষ্টই দেখিয়েছে অনতি অতীতের উষ্ণ আবহাওয়ার ব্যাখ্যা ভূ-উষ্ণায়ণ মডেল ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়েই ধারাবাহিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না।...কেবলমাত্র প্রাকৃতিক চক্রের ফলে এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এতই কম যে তা দিয়ে এই বেতালা ব্যবহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কেবলমাত্র এই ক্ষুদ্র সম্ভাবনার কথা মনে রাখলে বলতে হয় যে চাকরি করে নিয়মিত রোজগারের পথ ছেড়ে দিয়ে ক্রমাগত লটারির টিকিট কাটলেই জীবন-নির্বাহ সম্ভব!"

ব ই মে লা য় বি ও বি

২০১৩-এর ৩৭ তম কলকাতা পুস্তক মেলার আসর আবার মিলন মেলায়।
দৌড়ো দৌড়ি-সাজিয়ে বসা আর প্রকৃতির-অসহযোগ সহযোগে এই মেলায় থাকছে
বিওবি, যথারীতি ছোট্ট টেবিল স্পেস-এ। উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত-জন অথবা হারিয়ে
যাওয়া-হারাতে বসা কিংবা হঠাৎ হয়ে-যাওয়া বন্ধুদের
সঙ্গে নতুন করে চেনাচিনিটুকু।
এইই তো বিওবি-র পড়ে পাওয়া
চোদ্দো আনা.....।
টেবিল নং ৪৩

পেটেন্ট ও ওষুধের কিস্যা

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

গ্যাট চুক্তির কুড়ি বছর পর জীবনদায়ী সহ বিভিন্ন ওষুধের মূল্য নির্দ্ধারণে পেটেন্ট ব্যবস্থায় কী প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়ে ভারত সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে। পেটেন্ট ব্যবস্থাকে নিন্দা করে যাঁরা গত আড়াই দশক ধরে সরব, তাঁরা পেটেন্ট ব্যবস্থার বিরূপ প্রভাব নিয়ে যে সমস্ত কথা প্রকাশ্যে বলে আসছিলেন, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ক্ষমতাবান সরকারি কমিটি কার্যত এই সমস্ত নিন্দুকদের 'কুৎসা'-র সারবত্তা মেনে নিলো।

বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা প্রতিনিধিদের সংগঠন, যেমন ফিকি, মালিকদের সংগঠন যেমন ফার্মা ইন্ডাষ্ট্রি অ্যাসোসিয়েসন ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা করে কমিটি বুঝতে পারে যে, পেটেন্টকৃত ওষুধের মূল্য নির্দ্ধারণ অতি দুরূহ কাজ। যদি সরকার কোনও ভাবে পেটেন্টকৃত ওষুধের মূল্য বেঁধে দিতে সক্ষম হয়, তবুও সেই মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে। এই কেলেঙ্কারিটি, অর্থাৎ ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে, এমন এক 'কুৎসা' (বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উবাচ) পেটেন্ট বিরোধী আন্দোলনের মানুষরা যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব সহকারে তুলে ধরেছিলেন! সরকারি কমিটি তিনটি সিদ্ধান্ত টেনেছে। তাদের মতে পেটেন্ট কৃত ওষুধের মূল্যমান বাঁধতে হলে 'তিন ধরণের' ওষুধের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

এক জাতের ওষুধ, যা সম্পূর্ণ 'নতুন' যা একই রোগ নিরাময়কারী বাজারে চালু ওষুধের সঙ্গে তুলনীয় নয়। দ্বিতীয় জাতের ওষুধ হলো বাজারে প্রচলিত ওষুধের তুলনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর এবং তৃতীয় জাতের ওষুধ হলো যেগুলো কার্যকারিতার দিক থেকে বাজারে প্রচলিত ওষুধের সঙ্গে তুলনীয়।

সরকারী কমিটি এই তিন জাতের ওষুধের জন্য তিন রকমের বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারণের সুপারিশ করে। এই মূল্যমান নির্দ্ধারণে কমিটি গ্রস জাতীয় রোজগার, ক্রয় মূল্যের সমতা ইত্যাদি নানান সূচক ব্যবহার করে সর্বাধিক মূল্য নির্দ্ধারণ করে আবিষ্কার করে যে সেই মূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকবে। যদি সেই মূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে কোম্পানিগুলোর মুনাফার হার কমে যাবে এবং তারা তাদের ওষুধ ভারতের মাটিতে বিক্রি করার উৎসাহ হারাবে; জীবনদায়ী ওষুধ সহ বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধকারী ওষুধ ভারতের বাজার থেকে উধাও হয়ে যাবে। ওষুধের সংকট সৃষ্টি হবে এবং বাজারে চালু ওষুধগুলোর মূল্যে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা দেখা যাবে।

পেটেন্ট নিয়ে বিতর্ক চলার সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে ওষুধের পেছনে পারিবারিক খরচের বিন্যাস কেমন, সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষায় জানা যায় যে ভারতের একজন গড়পড়তা নাগরিক ওষুধ কেনাও বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার জন্য মোট খরচের ২১ শতাংশ পায় নানা জাতের সরকারি অনুদান বা ভরতুকি থেকে, আর বাকি ৭৯ শতাংশ খরচ সে তার নিজস্ব রোজগার এবং সঞ্চয় থেকে মিটিয়ে থাকে। যে ২১ শতাংশ খরচ সে সরাসরি মেটায় না, তার সিংহভাগ আসে স্বাস্থ্যবীমা থেকে। তথা কথিত উন্নত দেশগুলোতে এই অনুপাত ঠিক বিপরীত-বীমা সংস্থা মেটায় প্রায় ৮০ শতাংশ খরচ আর রোগী নিজের থেকে খরচ করে মাত্র ২০ শতাংশের মতো! ভারতকে উন্নত দেশের সমতুল্য করে তুলতে উদ্‌গ্রীব বিশ্বব্যাঙ্কের পেনসন-প্রাপ্ত প্রাক্তন আমলাবৃন্দ দেশটাকে সাহেবি ছাঁদে সাজাতে চান। তাই কমিটির মুরুব্বীদের সর্বসম্মতিক্রমে নিদান হলো আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানুষের পকেটের চাপ কমানোর জন্য বীমা-র গুরুত্ব ('উন্নত' দেশগুলোর মতো) বাড়তে হবে এবং সামাজিকভাবে কল্যাণকর খাতে সরকারি ভরতুকি কমাতে হবে। বলাই বাহুল্য, সেই মোতাবেক কাজ শুরুও হয়ে গেছে।

কৃষাণ স্বাস্থ্য বীমা থেকে শুরু করে নানান স্বাস্থ্যবীমা-র পরিকল্পনা করছে সরকার। সরকার যে 'হেলথ কার্ড' দেবে,

তার বিনিময়ে সরকারি -বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে বীমা-র মাধ্যমে। এখন আবার সরকার বলছে বীমা-কারীর বীমা সংস্থা থেকে টাকা পেতে দেরি হয়, অতএব সরকার বীমার টাকা অতঃপর সরাসরি বীমা-কারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ পাঠিয়ে দেবে। 'আধার-কার্ড' মারফৎ সেই টাকা লেনদেন চলবে।

যে অল্প কটি রাজ্য এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে মার্কিন দেশের ধাঁচে এই 'এক ছাদের তলায় যাবতীয় পরিষেবা'র ব্যবসায়িক ধারণা চালু হয়েছে, সেখানের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। দিল্লি-হরিয়ানার মতো 'উন্নত' রাজ্য-র কথা ধরা যাক্। সেখানে ৩০ থেকে ৬০ হাজার টাকার স্বাস্থ্যবীমা, ফোঁড়া কাটা, দাঁত তোলা-র মতো সাধারণ চিকিৎসাতেই বীমা কোম্পানির সঙ্গে আঁতাত করে বেসরকারি নার্সিংহোম গুলো সেই পুরো টাকা তুলে নিচ্ছে এবং বীমাকারী আর কোনও রোগের বীমার সুবিধে পাচ্ছে না। এই চিকিৎসার খরচের বড় অংশ পেটেন্টকৃত ওষুধের দাম-যে ওষুধের দামের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় (সরকারী বক্তব্য), ফলে লাভ ওষুধ আর বীমা কোম্পানির, যাদের প্রায় পুরোটাই বেসরকারিকরণের হুজুগে বিদেশি!

লাভ হয়েছে ভারতের আর একশ্রেণীর মানুষের। যাদের সংখ্যা বিশ্বায়নের সঙ্গে সংযুক্ত নিঃশ্বায়নের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বলা যায়। এরা হলো ঝক্‌ঝকে ইন্ডিয়ার সেই জনগণ, যারা বিদেশি শপিংমল-এ বাজার করে, বিদেশি হোন্ডা গাড়ি চড়ে, বিদেশে ছেলে-মেয়েদের পড়ায়, যাদের হাতের ঘড়ির সময়টাই কেবল এলাহাবাদের সময় সূচিত করে, যাদের প্রাণ-মন এবং ক্ষেত্রবিশেষে দেহ-ও পড়ে আছে সাগর পারের সেই স্বপ্নপুরে। বিশ্বায়ণ চালু হওয়ার আগে তাদের সংখ্যা ছিলো কমবেশি ১ কোটি, আজ তারা বেড়ে হয়েছে ২.৫ কোটি। সংখ্যাটা ইউরোপের অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার কাছাকাছি বা বেশি। তাই ইউরোপের বাজার ছেড়ে ভারতের এই স্তরের মানুষের জন্য ব্যবসার পসরা সাজানো অনেক বিদেশি সংস্থার কাছে অধিকতর লাভজনক। ভারতের ৫০-৬০ কোটি মানুষ এখন এই ২.৫কোটি মানুষকে ভরতুকি দিচ্ছে- বিদেশি বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমা সংস্থাগুলো আমজনতার স্বাস্থ্যবীমার টাকা ছিনতাই করে ভারতের এই স্তরের মানুষদের জন্য, তাদের দৃষ্টিতে সস্তায় নানা স্বাস্থ্য-প্যাকেজ হাজির করছে, যার গালভরা নাম 'করপোরেট হেলথ চেক আপ্'! এক সময় যারা সরাসরি মানুষ বেচা-কেনা করে ব্যবসায় হাত পাকিয়েছিলো, তারা আজ নতুন রূপে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে। স্পার্টাকাস দাস -বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আর আমাদের শাসকরা দেশটিকে দাস-সরবরাহের উৎস হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। 'নিন্দুক'-দের আর কটা 'কুৎসামূলক' ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়ে উঠবে তা ভবিষ্যত-ই বলে দেবে!

অন্যরকম কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

❐ নিউক্লিয়ার বোমা নয় ❐ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা
❐ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা ❐ পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ
❐ পরিবেশ আইন-কানুন ❐ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান
❐ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ ❐ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়
❐ পরমাণু চুক্তি নয় - বিকল্প শক্তিই ভরসা

পাওয়া যাবে দুহাজার বারো-র কলকাতা বইমেলায় বিভাবি-র স্টলে ও অন্যত্রও।
বিভাবি-কে আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য ডাকযোগে অথবা; অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।
প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাড়ে আটটা) ২/১ এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

সুপার পাওয়ার আমেরিকার উত্থানে ফ্লুরাইড দূষণের ভূমিকার নেপথ্য কাহিনী

মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

["আজগুবি এমন কিছু নেই যা উপযুক্ত সরকারী ক্রিয়াকর্মদ্বারা গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস হিসাবে তৈরি না করা যেতে পারে।"—ব্রাট্রান্ড রাসেল (An Outline of Intellectual Rubbish)]

বিজ্ঞানভিত্তিক নবতর শিল্পে ফ্লুরাইড বিষণ

অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে ফ্লুরিন পরিচয়ের আলোতে এলো উনবিংশ শতকের শেষ দিকে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য ভাগ পর্যন্ত ফ্লুরিনের রসায়ন ও বিষক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা ছিলো না। সে সব বিষয়ে অনুসন্ধানও বিশেষ হয়নি। তবে এটাও ঘটনা যে নানারকম ধাতুনিষ্কাশনে ফ্লুরাইডকে বিগলক বা ফ্লাক্স হিসাবে ব্যবহার করতে হতো যাতে চুল্লীতে আকর (বা 'ওর') গুলি সহজে গলে ও ভালভাবে মিশে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়। তাই শিল্পবিপ্লবের ক্রমোন্নতিতে, বিশেষ করে ১৯২০ -এর দশকের বিপুল শিল্প সম্প্রসারণের কালে আয়রণ-স্টীল, অ্যালুমিনাম ও সুপারফসফেট শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ ঘটে। বেশিরভাগই লোকচক্ষুর অন্তরালে। এর ফলে অদৃশ্য ফ্লুরাইড (হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড বা ধাতব ফ্লুরাইডরূপে), শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত হয়ে জল, বাতাস, মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সকলকেই বিষিত করতে আরম্ভ করলো। একেই বলা হয় শিল্পজনিত ফ্লুরোসিস (Industrial Fluorosis)।

দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব

সবাই জানে শিল্পবিপ্লব কথাটির অর্থ হলো মূলত কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তর। ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কারই শিল্পবিপ্লবের মূলে কাজ করেছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হলো কয়লা ও বাষ্পশক্তির ব্যাপক ব্যবহার। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব যা মোটামুটি ১৮৫০ এর দশকে প্রধানত আমেরিকাতেই শুরু হয় তাতে রসায়ন বা কেমিষ্ট্রি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে লাভোয়েসিয়ে ও জন ডালটনের পর কেমিষ্ট্রি আধুনিক বিজ্ঞানের রূপ পেলো।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিসিমার পদ্ধতিতে স্টীল উৎপাদন প্রযুক্তি (১৮৬০ এর দশকে) একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা। আর ১৮৮০ এর দশকে আমেরিকার হল (Hall) ও ফ্রান্সের হিরো (Hereault) বক্সাইট আকরিক থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনাম ধাতু নিষ্কাশন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রসায়নের নানা বৃহৎ শিল্প ব্রিটেন, জার্মানি ও আমেরিকায় গড়ে উঠতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্থ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায় বিদ্যুৎশিল্পের সম্প্রসারণ হয়। ক্রমে শিল্প প্রযুক্তিতে আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলো, তার সাথে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতেও।

বিবদমান দুইপক্ষের যে পক্ষ শিল্প-প্রযুক্তি শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর তাদেরই যে জয় হয়, এটাই স্বীকৃত সত্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-প্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নতিতে বহিরাগতদের (Immigrants) জন্য মুক্ত দুয়ারনীতি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নিউইয়র্ক বন্দরে স্ট্যাচু অব লিবার্টির গায়ে খোদিত সেই উদাত্ত স্বাগত আহ্বান আজও সমুজ্জ্বল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির আগে পর্যন্ত (১৯১৭) বিশ্বরাজনীতি থেকে আমেরিকা দূরেই সরে ছিলো। কিন্তু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান যখন পার্লাহারবারে আমেরিকার নৌঘাঁটি ধ্বংস করলো তখনই আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভীষণভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললো (১৯৪২)।

জার্মানি যখন ব্রিটেনের একমাত্র অ্যালুমিনাম কারখানা বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করলো তখন আমেরিকা থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন—"আমরা বছরে পঞ্চাশ হাজার করে প্লেন বানাবো।"

অবশেষে আমেরিকা পরমাণু বোমা তৈরির জন্য 'মানহাট্টান প্রোজেক্ট' শুরু করলো ১৯৪২ সালে। যার পরিণতি ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসের হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকা প্রথম স্থানে উঠে এলো। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আমেরিকা সুপার পাওয়ারের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হলো।

মানহাট্টান প্রোজেক্টের বিভিন্ন প্রকল্পে এক লক্ষ তিরিশ হাজারের (১,৩০,০০০) বেশি মানুষ কাজ করতো। ব্যয় হয়েছিলো আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি আমেরিকান ডলার। পরমাণু বোমার বাস্তব পরিকল্পনা, নকশা, ছক তৈরি হয়েছিলো নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালামস ল্যাবরেটারিতে রবার্ট ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা। অন্তত ৩০টি স্থানে অন্যান্য কাজ হতো। ইউরেনিয়াম আকরিক আসতো বেলজিয়ান কঙ্গো, কানাডা ও আমেরিকার নানা স্থান থেকে। পরমাণু বোমার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রস্তুত হতো নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার অঞ্চলে যেখানে বহু কোম্পানী, কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও তার সাথে যুক্ত ছিলো। সমস্ত কাজকর্মই হতো অত্যন্ত গোপনীয়তায় (Top Secret), যার বেশিরভাগ আজও অপ্রকাশিত। প্রতি মাসে অন্তত ৩৩ টন ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড, সংক্ষেপে 'হেক্স' তৈরী হতো। জুলাই ১৯৪৫ সালে, সমৃদ্ধকৃত (Enriched) ইউরেনিয়াম-২৩৫ (প্রায় ৮৯ শতাংশ) এখান থেকে ডেলিভারি হয়েছিলো।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের যে দু'টি আইসোটোপ থাকে তার মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ হলো বিভাজনশীল (Fissionable), বাকিটা ইউরেনিয়াম -২৩৮ যা বিভাজনশীল নয়। এদের পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তারজন্যে ইউরেনিয়াম অক্সাইড, যাকে 'ইয়েলো কেক' বলা হয়, তৈরি করে তাকে অপেক্ষাকৃত উদ্বায়ী ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইডে (হেক্স) পরিণত করে গ্যাসীয় ব্যাপন প্রক্রিয়ার (Gaseous diffusion) মাধ্যমে পৃথক করে পরমাণু বোমার মশলা প্রস্তুত হয়। এইসব ক্রিয়াকর্মে হাজার হাজার টন ফ্লুরিন, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড ব্যবহার করতে হতো। তার অন্তত শতকরা দশ ভাগ ফ্যাক্টরির চিমনি দিয়ে বা অন্যভাবে পরিবেশে ছড়িয়ে যেতো। আবশ্যিকভাবেই সেটা কর্মীদের, এমনকি বিজ্ঞানী এঞ্জিনিয়ারদেরও ক্ষতি করতো। পরিবেশের মানুষ জন, পশুপাখী, উদ্ভিদসমূহেকে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতো। লোকেরা সবটা না জানলেও কিছুটা বুঝতো। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নিরুপায় হয়ে সবাইকে চুপ করেই সব সইতে হতো। যুদ্ধের শেষ দিকে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪৮ টন করে 'হেক্স' উৎপন্ন হতো।

তপ্তযুদ্ধ (Hot war) শেষ হবার পরও কিন্তু পরমাণু বোমার উৎপাদন, পরীক্ষা, ধাতুনিষ্কাশন শিল্পের উৎপাদন না কমে ক্রমাগত বেড়েই চলেছিলো। কারণ তখন চলেছিল ঠাণ্ডা লড়াই এর (Cold war) কাল, MAD (Mutially Assured Destruction) এর প্রতিযোগিতা।

কুয়াইহোগা নদীর পাড়ে মানহাট্টান প্রোজেক্টের ইউরেনিয়াম টেট্রাফ্লুরাইড প্রস্তুতের একটি গুরত্বপূর্ণ কারখানা ছিলো। এই কারখানাটি চালাতো হারস কেমিক্যাল কোম্পানী। ১৯৪৪ সালের জুন মাসের মধ্যেই এখান থেকে রোজ এক টন করে 'হেক্স' তৈরি হয়ে সড়কপথে ওকরিজের R-25 গ্যাসীয় ডিফিউসন প্ল্যান্টের জন্য পাঠান হতো আইসোটোপ পৃথক করার জন্য।

ফ্লুরিন ও হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ফ্লুরস্পারের ব্যবহার ১৮৮৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত শতগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। ১৮৮৭ সালে যা ছিলো মাত্র ৫,০০০ টন ১৯৫০ সালে তা হলো ৪,২৬, ০০০ টন। দুর্বোধ্য নয়, সাধারণ-আমেরিকানরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। কিন্তু তখন ক্ষতিপূরণ দাবী করাও সম্ভব ছিলো না।

বিজ্ঞানের বিকৃতি

বৃহৎ শিল্প, সামরিক কায়েমীগোষ্ঠী ও সরকার এই ত্রয়ীর কঠিন লৌহ ত্রিভূজই হলো মিলিটারি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। কিছু বড়ো কোম্পানির নাম হলো—ডুপন্ট, ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানী, রেনল্ডস্ মেটাল, ইউনিয়ন কার্বাইড, অ্যালকোয়া।

ধাতুশিল্পের বিকাশে বিশেষ করে এলুমিনাম ধাতু নিষ্কাশনে ফ্লুরাইডের ব্যাপক ব্যবহার বাড়ছিলো। ১৯৫০ এর দশকে আমেরিকার অ্যালুমিনাম কারখানাগুলিতে লক্ষাধিক লোক কাজ করতো। কয়েকটি কারখানা জনবসতির কাছে থাকায় নিকটবর্তী অঞ্চলের গাছপালা, মানুষজন, ঘোড়া, শুয়োর, গবাদি পশুর ক্ষতি সহজেই দেখা যেতো। যুদ্ধ শেষ

হবার পরই জনসাধারণের ফ্লুরাইড বিষণ বিরোধিতা তীব্রতর হলো। আদালতে কোম্পানীদের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষতিপূরণের মামলা হতে লাগলো। দেহে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, ফ্লুরাইড প্রভৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মানহাট্টান প্রোজেক্টের মেডিক্যাল ডিভিসন বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার কাজকর্ম করেছিলো। সব তথ্যই গোপন রাখা হয়েছিলো। আজও অনেকটাই আছে।

পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু ও বন্দীদের ওপর বিস্তর অনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিলো তাদের সজ্ঞাত সম্মতি ছাড়াই। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, ফ্লুরাইড ও অন্যান্য দ্রব্যে মানুষের শরীরে কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে প্রায় ষোলহাজার অনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিলো। এ সব তথ্যই গোপন রাখা হয়েছিলো। বিল ক্লিন্টন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার পর মানুষের দেহে বিকিরণের প্রভাবের বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য ১৯৯৪ সালে যে উপদেষ্টা কমিটি স্থাপন করেন তার ফলে ১৯৯৭ সালে প্রায় ষোল লক্ষ (১.৬ মিলিয়ন) পাতার গোপন (Classified) নথি প্রকাশ্যে আনা হয় (Declassified)। কিন্তু ফ্লুরাইড সম্পর্কিত বহু নথি আজও অপ্রকাশিত। যারা অনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার বা তাদের জীবিত নিকটতম আত্মীয়দের কাছে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্লিন্টন ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে পরিবার পিছু চার লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেন।

সদ্য প্রকাশিত এইসব নথিপত্র থেকে ফ্লুরাইড বিষণের গভীরতা ও ব্যাপকতার সমগ্র চিত্র না পাওয়া গেলেও যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে শিল্প ও সরকারি মহল খুবই আতঙ্কিত। কিন্তু ফ্লুরাইড বিষণে ক্ষতির দায় কোনো প্রেসিডেন্টই নিতে চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তাই তারা অত্যন্ত সুচতুরভাবে ফ্লুরাইডের বিষণমুখকে বিজ্ঞানের মোড়কে প্রলেপ দিয়ে সীমিত মাত্রায় তা যে অক্ষতিকর ও গ্রহণযোগ্য, তারজন্য বিজ্ঞানকেই বিকৃত ও ভ্রষ্ট করার সব রকম প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন এবং অনেকটাই সফল হলেন। ফ্লুরাইডের নির্দোষীতা আদালত ও গণমানসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোটি কোটি মানুষের নিত্য ব্যবহার্য টুথপেস্টে ফ্লুরাইড যোগ করার ('ফ্লুরিডেশন') ব্যবস্থা হলো। তবু শেষ রক্ষা যে হবে না তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ফ্লুরিন বিরোধীরা আজ বিজয়ের পথে। একই রকম চিত্র নিম্নমাত্রার পরমাণু বিকিরণ বিরোধী আন্দোলনের। অথচ এ দু'টি বন্ধ করতে হলে বন্ধ করতে হয় বহু কোম্পানী বা শক্ত নিয়ন্ত্রণ বসাতে হয় লৌহ-ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ও পরমাণু জ্বালানি শিল্পে অথচ এগুলোই আমেরিকার 'সুপার পাওয়ার' মর্যাদা, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি। রাষ্ট্রের এই সুপার পাওয়ার মর্যাদার মূল্য যুগিয়েছে এবং যোগাচ্ছে আমেরিকানরা। তাই নিম্নমাত্রার ফ্লুরাইড ও বিকিরণ দূষণ-বিষণকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমেরিকার মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল-কমপ্লেক্সের আপ্রাণ চেষ্টা, না হলে ক্ষতিপূরণের মামলার সুনামি কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েও কুলানো যাবে না। আমাদের ভূপালের রাসায়নিক দূষণ যার অনুরূপ ঘটনা।

মানহাট্টান প্রোজেক্টের অতি গোপনীয় পরমাণু বোমা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিলো ১৯৪৭ সালে। সেই প্রকল্পের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম তৈরি করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলো কিছু বড়ো বড়ো কনট্রাক্টর শিল্পসংস্থা যার অন্যতম ছিলো ডু পন্ট কোম্পানী। নিউজার্সিতে তাদের মস্ত কেমিক্যাল প্ল্যান্টে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে এক দুর্ঘটনায় বিষাক্ত কিছু গ্যাস (পরে যা হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড বলে জানা গিয়েছিলো) এক রাতে নিউজার্সির কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানকার বড়ো বড়ো পীচ বাগিচার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। পশু খামারে ঘোড়া ও গবাদি পশুরা অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মারাও যায় অনেক। মানুষের ভেতরও নানা রকম অসুস্থতা দেখা দিলো। সকলের সন্দেহের তির গেলো ডু পন্ট কারখানার দিকে। কিন্তু তখন ভয়ঙ্করভাবে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত চাষীরা অপেক্ষা করলো। ১৯৪৬ সাল থেকেই নিউ জার্সির চাষীরা আমেরিকার পরমাণু বোমা প্রকল্প ও ডুপন্ট কোম্পানীর বিরুদ্ধে আদালতে আইনী বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। গভর্নমেন্ট-মিলিটারি-কোম্পানীদের ভেতর পরে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মানুষের ক্ষতি আদালতে প্রমাণ হলে যা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তাতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে আমেরিকা পিছিয়ে পড়বে ও আমেরিকার সামরিক শক্তির ভিত্তি (লৌহ-ইস্পাত, অ্যালুমিনাম ও ইউরেনিয়াম পরমাণু জ্বালানি উৎপাদন) কমাতে হবে, হয়তো বা বন্ধ করে দিতে হবে।

১৯৪৪ সাল থেকেই পরমাণু শক্তি প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের দিয়ে শুরু করা হলো মানুষের ওপর পরীক্ষা। তাতে যদি

দেখানো যায় যে সামান্য মাত্রার ফ্লুরাইড দূষণ মানুষের ওপর তেমন ক্ষতি করে না, তবে আদালতকে নিরস্ত করা যাবে। ১৯৪৫ সাল থেকেই নিউবার্গ ও কিংসটনে জনসাধারণের ওপর শুরু হলো বাধ্যতামূলকভাবে ফ্লুরাইডযুক্ত পানীয় জল সেবনের ব্যবস্থা। সেই সব পরীক্ষা আজও চলছে। শুধু চলছে নয় বিগত ছ'দশকের বেশি সময়ে তাদের বিস্তার ঘটানো হয়েছে। মানুষের দেহে ফ্লুরাইডের প্রভাব সম্বন্ধে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দিয়ে বিস্তর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়েছে পরমাণু শক্তি কমিশনের তত্বাবধানে। ওইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজগুলি প্রধানত হতো রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে, নানারকম সুযোগ- সুবিধার ব্যবস্থা করে, সর্বোপরি বিজ্ঞানকে বিকৃত করে ফ্লুরাইডের নির্দোষ এক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা আজও অব্যাহত। এখানে উল্লেখ করা যায় যে আমেরিকার জনসাধারণ মিলিটারি-ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করে ফ্লুরাইড নিয়ে, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিরুদ্ধে নয়।

কৃষক বনাম আধুনিক অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ঃ ঐতিহাসিক মামলা

১৯৫৫ সালের পল ও ভেরা মার্টিনের রেনলডস্ মেটাল কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনী লড়াই আধুনিক আমেরিকার আদালত কক্ষের লড়াই-এর ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লাসকর একটি ঘটনা। একদিকে একজন আমেরিকান কৃষক, একটি র‍্যাঞ্চ মালিক, অপরদিকে কয়েকটি সর্বোচ্চ আমেরিকান শিল্প কর্পোরেশনের সমবেত আর্থিক ও আইনি শক্তি। জর্জইস্টের জেলা আদালতের নাটক সে সময় বড়োই মনোহারি হয়েছিলো।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়ে মার্টিন তার ট্রাউটডেল র‍্যাঞ্চে বাস করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন ব্যাঞ্চে থাকা তাঁর গবাদিপশুর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর র‍্যাঞ্চে একের পর এক গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শুকরাদি মরছেই; এখন তাঁর পরিবারও অসুস্থ। মেয়ে পাওলার হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা লাগে, গোড়ালি টক্ টক্ করে ওঠে। বাড়ির তিনজনেরই হাড়ে ব্যথা। হজমের বেজায় গোলমাল, দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। অদ্ভুত এক উদ্বেগে রাতে ঘুম হয় না।

ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন অদূরবর্তী রেনলডস্ মেটালের অ্যালুমিনাম কারখানার চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়াই এ সবের মূলে কাজ করছে। শুরু হলো এক আইনি যুদ্ধ। মার্টিন মামলা আমেরিকাকে চঞ্চল, বিহ্বল করে তুললো। এর আগে পর্যন্ত আমেরিকায় কোনো আদালত কখনো শিল্পকারখানা নির্গত ফ্লুরাইডে মানুষের ক্ষতির কোনো মামলার সম্মুখীন হয়নি। মামলার ওই অভিযোগ মেনে নিলে যে নজীর সৃষ্টি হবে তাতে ভবিষ্যতে অনেক মামলা মোকদ্দমার দুয়ার খুলে যাবে, যার ফলে জাতির যুদ্ধ করার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মনসান্টো ও অ্যালকোয়া নিয়ে আরো ছ'টি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী আদালতে রেনলডস্ মেটালের পক্ষে অর্থাৎ মার্টিনদের বিপক্ষে দাঁড়ালেন।

আদালতে আইনজীবীদের প্রচণ্ড লড়াই হতে থাকলো। ১৯৫৫ সালে মার্টিনদের পক্ষে বিখ্যাত মেডিক্যাল স্পেশালিস্ট ড. ডোনাল্ড হান্টারকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হলো। হান্টার বিজ্ঞানসাহিত্য মন্থন করে জুরিদের কাছে প্রমাণ করলেন যে মার্টিন পরিবারের অসুস্থতা তীব্র বা অ্যাকিউট ফ্লুরাইড বিষণের ধ্রুপদী (Classic) লক্ষণাবলীর ঠিক পূর্ববর্তী স্তরের।

হান্টার জুরিদের জানালেন ঃ 'ফ্লুরাইড স্তন্যপায়ীদের দেহকলায় তীব্র বিষ এবং মানুষ, গরু ও ভেড়ার মতো একটি স্তন্যপায়ী জীব'। হান্টার বললেন যে ফ্লুরাইড মার্টিনদের গবাদিপশুদের মেরেছে এবং তার পরিবারকেও অসুস্থ করেছে। ফ্লুরাইডের ভয়ঙ্কর বিষক্রিয়া একাধিক এনজাইমের ক্রিয়া বিঘ্নিত করে কারণ ফ্লুরাইড হলো একটি এনজাইম বিষক। ফ্লুরাইড এমনই একটা ভয়ঙ্কর বিষ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলার বিষ প্রয়োগ করে সামরিক বাহিনীর সেই সব সেনাপতিদের সরিয়ে দিতেন যাদের তিনি চাইতেন না। তিনি একটা ভোজের ব্যবস্থা করে অনেককেই নিমন্ত্রণ করতেন এবং খানসামা ও পরিচারকদের নির্দেশ দিতেন যাদের সরাতে চান তাদের স্যাম্পেনের বোতলে যেন ফ্লুরাইড ইনজেক্ট করা হয়।

এনজাইম বিষক হওয়ায় ফ্লুরাইড মানুষের স্বাভাবিক শত্রু। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোর্টল্যান্ডের জুরিরা মার্টিনদের পক্ষে রায় দিলেন। অসুস্থতা ও চিকিৎসার খরচপত্রের জন্য মার্টিন পরিবারকে ৪৮,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণের সওয়াল করলেন। রেনলডস পক্ষেরউকিলরা

বললেন মার্টিন কেসের এই রায় ভবিষ্যতে শিল্পপতিদের বহু কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার দরজা খুলে দিলো। 'আমাদের জাতির নিরাপত্তায় অ্যালুমিনাম ভীষণই গুরত্বপূর্ণ এবং আমাদের সমগ্র অর্থনীতিতে এই ধাতুটির গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান'। ফ্লুরাইড নির্গমণ একেবারে বন্ধ করে দিতে হলে এই ধাতুটির উৎপাদনই বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সুতরাং শিল্পপতিরা উচ্চতর আদালতে নিম্ন আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আপীল করলেন। ১৯৫৭ সালের ২৪ এপ্রিল সানফ্রানসিস্কোর ফেডারেল আপীল কোর্টের নবম সার্কিট বেঞ্চে জর্জ ডেনম্যান, পোপ ও চেম্বারস নিম্ন আদালতের রায়টিই বহাল রাখলেন। আরো কঠোর ও তীব্র ভাষায় রেনলডস্ মেটাল কোম্পানীকে সবদিক থেকেই দায়ী করলেন।

উদ্বেগে উদ্বেল শিল্প পতিরা আবার কোর্টে ফিরে এলেন আপীল নিয়ে। এবারে কোর্ট বসলো সকল বিচারপতিদের নিয়ে (Enbanc), শুধুমাত্র তিনজন নয়। এবারে হতবাক করার মত আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখা গেল। কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রিলিফ চেয়ে আদালতের বন্ধু হিসাবে ('Amicus Curiae') সারি দিয়ে দাঁড়ালেন বিশাল শিল্প প্রতিনিধিরা, যার মধ্যে ছিলেন—অ্যালকোয়া, মনসান্টো, কাইজার এলুমিনাম, হার্ভে এলুমিনাম, ওলিন ম্যাথেয়িসন, কেমিক্যাল কর্পোরেশন প্রভৃতিরা।

জর্জ ডেনম্যান দাপটের সঙ্গে রায় লিখলেন, অ্যালুমিনাম ও অন্যান্য যে সকল শিল্পে ফ্লুরাইড ব্যবহৃত হয় তারা সবাই চরম বিপজ্জনক (Ultra hazardous)। শুরু হলো গবর্ণমেন্ট ও শিল্পসংস্থাগুলির জরুরি মন্ত্রণা। কেমন করে এই সংকট থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, বাঁচবার পথ বার করা যায়। এই সবের ফল হলো, যে সব বিজ্ঞান গবেষণা ফ্লুরাইডের বিষণ ভাবমূর্তি উন্মোচন করতে পারে অচিরেই সেই সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া। এমনকি যেসব প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ফ্লুরাইডের মারাত্মক বিষণ ক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয় বিখ্যাত পত্রপত্রিকাতে তাদের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া। লক্ষণীয়, আর্সেনিকের ব্যাপারে এই সব সমস্যা নেই। শুধুমাত্র স্বল্পমাত্রার ফ্লুরাইড আর লঘুমাত্রার পারমানবিক বিকিরণ নিয়ে বিশেষ কথাবার্তা আমেরিকার মিলিটারি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স কিছুতেই বরদাস্ত করে না। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন বলেছেন : You cannot fool all the people all the time। তাই এখন চলছে ফ্লুরিনপন্থী ও ফ্লুরিনবিরোধীদের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে, এমনটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। আমেরিকান গর্ভনমেন্টকে এলুমিনাম সরবরাহ করার জন্য ১৯৪১ সালে স্থাপিত এই ফ্যাক্টরিটি (১৬০০ একর) এখন সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়েছে। এটি এখন একটি 'সুপার ফান্ড সাইট' যা থেকে এখন বহু লক্ষ পাউন্ড ফ্লুরাইড সরানো হচ্ছে। ১৯৮০ সালের কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী গঠিত ই. পি. এ পরিচালিত এই তহবিল শ'আটেক বিষিত স্থানের মধ্যে মাত্র ১৬টি পরিষ্কার করতে পেরেছে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত।

এখন এটাই দেখবার যে বিনষ্ট মেধার নতুন প্রজন্ম, বয়স্কদের আর্থ্রাইটিস, হিপ্ ফ্র্যাকচার ও অ্যালঝাইমার রোগে পীড়িত আমেরিকানরা আর কত ক্ষতি স্বীকার করবেন তাদের রাষ্ট্রের 'সুপার পাওয়ার' মর্যাদা রক্ষার মূল্য দিতে। একই সঙ্গে নানারকম রাসায়নিক দূষণ-বিষণে আমেরিকা যে পৃথিবীর সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অপরদিকে উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাথে প্রজ্ঞার সংযুক্তি ঘটিয়ে ইউরোপীয়নরা উন্নয়নের পথে অনেকটাই সংযত হয়ে চলেছে। সেখানকার বেশিরভাগ দেশেই জলে ফ্লুরিডেশন করা হয় না; আর্সেনিক সমস্যারও সমাধান হয়েছে। বয়স্কদের হিপ ফ্র্যাকচার ও আর্থ্রাইটিসের এপিডেমিক কম।

সূত্র :

Joel Griffiths and Chris Bryson Fluoride, Teeth and The Atomic Bomb, 2007
[Laying Waste : The Poisoning of America By Toxic Chemicals by Michael Brown, 1981]
স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রকৃত আবিষ্কারক অ্যালবার্ট স্ক্যাজ (ইন্টারনেটে সহজলভ্য)-এর Low Level Fluoridation and Low-Level Radiation. Two Case Histories of Misconduct in Science (1996) রচনাটিতে স্ক্যাজ ভাববার মত দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ *আগের কালে বিজ্ঞান ছিলো নির্দোষ; কি আশ্চর্য! বিবর্তিত আধুনিক বিজ্ঞান এমন হয়েছে, যার জন্য ভয়ে সবাই কম্পমান—এ্যালবার্ট আইনস্টাইন।*
বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যাই বিজ্ঞানের অবদান—লিনাস পলিং।

এক বিদ্যানিধি এক মহারাজ ও "বিজ্ঞান"

অমিত চৌধুরী

জন্মের একশ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এক 'বিদ্যানিধি'-কে আমরা ভুলে গেছি—যাঁর নাম যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। এছাড়া, উড়িষ্যার কটক থেকে কিছুটা দূরের এক 'করদ' রাজ্যের মহারাজা বাসুদেব দেবকে মনে রাখার কোনো দায় আমাদের নেই। তবু, "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মী'-র পাতায় এই দুটি নাম—তুলে ধরতে চাই দুহাজার তেরো-তে-ও —যার কারণ—"বিজ্ঞান"!

পরাধীন ভারতে অসংখ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখা, নানান যন্ত্র-নির্মাণ, ল্যাবরেটরী থেকে শুরু করে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ গড়ে তোলা, স্বদেশের বিজ্ঞান ইতিহাস চর্চা, কলেজ স্তরের ও গবেষণা মূলক নানান বাংলা বিজ্ঞান-বই রচনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে—আজকের "বিজ্ঞান আন্দোলনের"— থেকে গভীরতর বহুমুখী সক্রিয়তায় স্বদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় মগ্ন ছিলেন—যোগেশ বিদ্যানিধি। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও বাংলা ভাষার উন্নয়ন থেকে শুরু করে স্বদেশী ভাণ্ডার গড়ে তোলা সহ নানাবিধ উদ্যোগে তার জীবনের মূল সুর ছিল শিকড়মুখী তীব্র স্বদেশ চেতনা। বামন্ডার মহারাজাকে কিভাবে তিনি বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুললেন তার কিছু কথা বলতেই এই লেখা। সাহেবী কায়দার কিছু কলেজ বা ইনস্টিট্যুট ছাড়া বা ব্রিটিশ প্রশাসক ও অধ্যাপকদের বিজ্ঞান নিয়ে নানা উদ্যোগের বাইরেও —বিজ্ঞান-চর্চার এবং সত্যিকারের স্বদেশমুখী বিজ্ঞান সাধনার যে ধারা একশ,দেড়শ বছর আগে এদেশে 'বেগবান' হতে চেয়েছিল তা স্বাধীন ভারতের নানা বৃহৎ কর্মকাণ্ডে-ও "মূলগতভাবে" সফল হয়নি! কেন হয়নি তা বুঝতে—বোধ হয় আমাদের যোগেশ চন্দ্রের মতো মানুষদের "সাধনা"-র দিকেই তাকাতে হবে।

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধকের জন্ম ২০ অক্টোবর, ১৮৫৯। মৃত্যু-৩০ জুলাই, ১৯৫৬। আপাতত —যাওয়া যাক কটকে আর তারপর যোগেশচন্দ্রের ভাষায়—"রাজ-সংসর্গে"! বাংলা ১৩০৭ সাল। বন্ধু শিক্ষক মধুসূদন রায়ের অনুরোধে কটকে আগত বামন্ডার মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন যোগেশচন্দ্র। মহারাজ এক কুঠিতে —এক বড় ঘরে তাকিয়ায় পিঠ দিয়ে বসে ছিলেন। যোগেশ যখনই শুনলেন মহারাজ 'বাতের ব্যাথায়'-নড়তে চড়তে পারেন না—তাঁকে বললেন "এক্সরে" যন্ত্রে কিভাবে হাড়ের বৃদ্ধি ধরা পড়ে। মহারাজ বাসুদেব সুঢল দেব অবাক বিস্ময়ে তা শুনলেন ও যোগেশচন্দ্রের অনুরোধে তাঁর বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীতে এসে হাড়ের 'এক্সরে' করালেন ও শান্তি পেলেন "বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে প্রমাণ পেয়ে" যে তাঁর হাড়ের বৃদ্ধি হয়নি! আত্মচরিতে যোগেশ লিখছেন তাঁর বিজ্ঞান প্রচারের কথা। "....বিজ্ঞান শালায় গেলাম, রন্টজেন আলোকে (এক্সরে) শরীরের হাড় দেখা খেলার মতো হয়েছিল।.... আরও দুই একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজন করে রাখলাম"। বিজ্ঞানের 'ক্ষমতা' দেখাতে —যোগেশ চন্দ্র পরীক্ষা করে আরও বোঝালেন—কেন কুয়োতে হঠাৎ নামলে বিপদ বা অপমৃত্যু হতে পারে—যা বামন্ডা রাজ্যে হয়েছে। এক্ষেত্রে বিপদ এড়াতে আগে "দীপ" নামিয়ে দেখা দরকার তা নিভে যাচ্ছে কিনা। অর্থাৎ—অক্সিজেনের অভাব ঘটছে কিনা। বিজ্ঞানের ক্ষমতা দেখিয়ে স্বদেশের এক মহারাজাকে এতটাই উৎসাহী করে তুললেন যোগেশ যে, ঘটল এক দারুণ ঘটনা। একশ বছরেরও বেশ আগে, এদেশে যখন বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার সবে ঘটছে, যখন ব্রিটিশ প্রশাসন বা দেশীয় অর্থবান/ক্ষমতাবান শ্রেণী "বিজ্ঞানের চেয়ে", "ধর্ম-কর্মের"। "হুজুগের উৎসবের" পৃষ্ঠপোষনা করতে বেশী আগ্রহী—তখন প্রস্তাবিত হলো বামন্ডার রাজবাড়ীতে তৈরী হবে এক "বিজ্ঞান-মন্দির"! এই বিজ্ঞান-মন্দির, বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী বা মিউজিয়াম তৈরী কিভাবে হবে—তা ঠিক করলেন যোগেশচন্দ্র, মহারাজের অনুরোধে! নানান যন্ত্র কিনে, বিজ্ঞান-মন্দির তৈরী করলেন মহারাজা। তারপর নিমন্ত্রণ করলেন যোগেশ চন্দ্রকে জঙ্গলের ভেতরে রাজার রাজ্যে বিজ্ঞান -মন্দিরের উদ্বোধন

বা আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটাতে। বামন্ডা রাজ্যে—রাজবাড়ীতে যাওয়া তখন সহজ নয়। বামন্ডা মোড় স্টেশন থেকে জঙ্গল-পাহাড়ের কাঁচা পথে যেতে হতো হাতী বা পাল্কিতে—৬৪ মাইল! গ্রীষ্ম, বর্ষা পেরিয়ে শরতকালে যেতে সম্মত হলেন যোগেশ। এক কষ্টকর নতুন যাতায়াতের অভিজ্ঞতা হলো—পাল্কি বাহনে—তিন দিনের যাত্রাপথে। বেহারাদের হাতবদল হয়ে, স্থানে স্থানে বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া করে অবশেষে মহারাজার গড়! রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলেন যোগেশচন্দ্র! হাতির পিঠে চড়ে যুবরাজ সচ্চিদানন্দ—এলেন তাঁকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতে। পরদিন উদ্বোধন —বিজ্ঞান মন্দিরের রাজবাড়ীর একতলার একপাশে দুটি লম্বা ঘরে যোগেশচন্দ্রের নির্দেশমতো কেনা—যন্ত্রের সারি। কেন এই আয়োজন? উত্তরে মহারাজা বলেছিলেন "আমাদের ছেলেরা সৎ দৃষ্টান্ত পায়না। সহজে বিগড়ে যায়। যদি বিজ্ঞানচর্চায় মত্ত হয় —আমি মনে করি সেটা পরম লাভ।" একশ বছরেরও আগে পরাধীন ভারতের অনুন্নত উড়িষ্যার—দুর্গম অঞ্চলে এক 'মহারাজার' পৃষ্ঠপোষণায়—এ যেন এক বিজ্ঞান আন্দোলন। স্বদেশের ইতিহাসের আনাচে কানাচে—এরকম অনেক জ্ঞান চর্চার, বিজ্ঞানচর্চার পরম্পরা, উদ্যোগ, পৃষ্ঠপোষণা খুঁজে পাওয়া যায় ব্রিটিশ ঐতিহাসিক বা প্রশাসকদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিপথের বাইরে বেরিয়ে অনুসন্ধান করলে।

তীব্র স্বদেশ মুখী চেতনায় কৌতুহল, জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানে যোগেশচন্দ্র সারাজীবন খুঁজেছেন দেশজ ধারায় জ্ঞান বা বিজ্ঞান চর্চার মনিমুক্তো। এভাবে তিনি উড়িষ্যায় আরো এক সাফল্য পেয়েছেন জ্যোতির্বিদ চন্দ্রশেখর সামন্ত কে আবিষ্কার করে। চন্দ্রশেখর পরিচিত ছিলেন "পঠাশি" সামন্ত নামে। নিজস্ব নকসার বাঁশের দূরবীনে আকাশে পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি— দুর্গম জঙ্গল ঘেরা খণ্ডপড়া রাজ্যের রাজার অধীনে। প্রাচীন দুই জ্ঞান-গ্রন্থ "সূর্য-সিদ্ধান্ত" ও "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" পরিমার্জন ও সংস্কার করে নতুন করে লেখেন চন্দ্রশেখর। এই "সিদ্ধান্ত-দর্শন" সম্পাদনা ও অনুবাদ করে বাংলা ও ইংরেজীতে তা জনসমক্ষে আনেন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি। শোনা যায় এই কাজের সাফল্যেই তাঁর 'বিদ্যানিধি' উপাধি লাভ। ছবছর ধরে ভারতীয় জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা, পড়াশোনা করেন যোগেশচন্দ্র ও প্রকাশ করেন এক জ্ঞান-সমৃদ্ধ বই—এ বিষয়ে (১৯০৩ সালে)। স্বদেশের "বিজ্ঞান" নিয়ে এরকম—একের পর এক কর্মসাধনা ও জ্ঞান সাধনায় সারাজীবন সক্রিয় ছিলেন বিদ্যানিধি—যার প্রায় সবকিছুই আজ বিস্মৃতির গর্ভে। আসলে তাঁর সাধনার মূল লক্ষ্য ছিলো স্বদেশের ধারায় —বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক চত্বরে নানান সাফল্য ও স্বীকৃতি পেলেও 'অধ্যাপক' জীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ড তাঁকে কখনও যন্ত্রনির্মাণ, কখনও ভাষার উন্নয়ন কখনও স্বদেশী ভাণ্ডার পরিচালনায় বা কখনও বিজ্ঞানের বিবিধ প্রয়োজনীয় সমসাময়িক বিষয়ে বাংলায় লেখালিখিতে মগ্ন করেছে—যার আসল তাগিদ ছিলো তাঁর চেতনার গভীরে। জনবিজ্ঞান ও জনশিক্ষার আন্দোলনের এই পথিকৃৎ মানুষটিকে —আমাদের বুঝতেই হবে নতুন করে।

লেখার তথ্যসূত্র :

(১) যোগেশচন্দ্রের আত্মচরিত—প্রকাশক মুনীন্দ্র রায়/ বাঁকুড়া/১৪০৯

(২) যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি—সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১৬৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ/১৪১৬

(৩) দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা—যোগেশচন্দ্র রায়, প্রবাসী / বৈশাখ /১৩২২

(৪) বিজ্ঞানের নানামুখ/ এককমাত্রা, নভেম্বর/২০০৯

এই ধোঁয়াশার শিকার আমরাও হয়েছি। ব্যক্তি বিশেষের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আচার-আচরণের বিচার করে রায় দিতে চেয়েছি, সমগ্র ব্যক্তিটি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন কিনা। মনে করেছি যে এতে আমরা ছোট বাস্তবতা থেকে সাধারণ বড়ো সত্যে উপনীত হবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই অনুসরণ করছি। বৈজ্ঞানিক মানসিকতার খণ্ডিত প্রকাশ হতেই পারে না, এমনটাই আমরা মনে করেছি। এসবের ফলে, মানুষ ছেড়ে তার মনের ঝোঁক আর দার্শনিক প্রবণতার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছি। ভুলে যেতে চেয়েছি যে জন্ম থেকেই কোথাও কোন ব্যক্তি-মানুষের মানসিকতা স্থির হয়ে যায়না। জীবনের চর্চা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মানসিকতাও বিকশিত হয়, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ব্যক্তির মতাদর্শগত তথা দার্শনিক অবস্থানও বদলে যায়। কারও মানসিকতা শতকরা পঁচিশ বা পঞ্চাশ বা আশি ভাগ বৈজ্ঞানিক এমন কথা শুনলে 'বিজ্ঞানমনস্ক' বন্ধুরা যদি আমাকে লাঠিপেটা নাও করেন, করুণার পাত্র গণ্য করবেন নিশ্চয়ই। আর যদি বলি, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ফর্মূলা বা লক্ষণ কার জীবনে কতটা প্রতিফলিত এ বিচারের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল—জীবনের পথ বেয়ে ব্যক্তিবিশেষ কতটা মানুষ হয়ে উঠছেন—সমস্ত রকমের গুরুগিরি বা আপ্তবাক্য বিচারহীন ভাবে মেনে না নেবার উপযুক্ত হয়ে উঠছেন, নিজস্ব যৌক্তিক স্বাধীন চিন্তা ও কর্মে স্থিত হবার আত্মবিশ্বাস অর্জন করছেন এবং নিজ স্বার্থের গণ্ডী কেটে যাবতীয় শিকল ছিঁড়ে আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে পারছেন—তার খোঁজ নেওয়া, তাহলেই বা বিজ্ঞানমনস্ক বন্ধুরা কি বলবেন, আমি জানি না।

প্রফুল্ল মূল্যায়ন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিচার —খুব কম হলেও— কিছু যে হয়নি তা নয়। আমার নজরে পড়া সেরকম কয়েকটি প্রকাশিত লেখা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করব।

বিগত শতকের সত্তর আশির দশকে 'বিজ্ঞান ও সমাজ' নিয়ে বেশ একটা ঢেউ উঠেছিল— কাজে ও লেখায়। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা সহ আমরাও তাতে অংশীদার ছিলাম। আমাদের পত্রিকার স্লোগানই ছিল—বিজ্ঞানকে সমাজমুখী এবং সমাজকে বিজ্ঞানমুখী করার লক্ষ্যে কাজ করা। স্বভাবতই এসে পড়ে বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা, ল্যাবরেটারির ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানকে দরিদ্র সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজে লাগানোর কথা, বিজ্ঞানকে ধারণ ও পোষণ করার উপযুক্ত সামাজিক প্রস্তুতির কথা। এসব বিবেচনার ক্ষেত্রে এদেশে প্রফুল্লচন্দ্রের মত প্রাসঙ্গিক আর কেউ নন। কিন্তু আজ নির্দ্বিধায় স্বীকার করি যে এজন্য আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের দিকে তেমনভাবে দৃষ্টিপাত করিনি, যতটা ও যেভাবে তার প্রয়োজন ছিল। পত্রিকার পঞ্চম বর্ষে প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রকাশিত হল[৪]—সেই প্রথম। লেখক বন্ধুবর পার্থ সেন—কলেজের রসায়ন শিক্ষক। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসঙ্গ না তুলেও তিনি উপসংহারে লিখলেন—"জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে অংশ বৃটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিলেন.....দেশীয় শিল্পের স্বনির্ভর বিকাশের প্রয়াসী ছিলেন..... আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হয়ে থাকবেন।" সমালোচনার দিকে পার্থর মন্তব্য—"একই সাথে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ও অন্যদিকে মার্কেনটাইল মেরিন সংস্থা ও ইনসিওরেন্স সংস্থার সম্প্রসারণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিল্পবিকাশ চিন্তার সীমাবদ্ধতাকেই চিহ্নিত করে।"

সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানের জোয়ারেও প্রফুল্লচন্দ্র সাধারণভাবে উপেক্ষিতই ছিলেন। এরই মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশনা- 'অন্বেষা' পত্রিকার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা[৫]। গোটা একটি পত্রিকার ৬০ পৃষ্ঠা জুড়ে উপস্থিত হলেন প্রফুল্লচন্দ্র। জীবনের নানা ঘটনা, মূল্যবান বেশ কিছু স্মৃতিচারণ, প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী কাজ ও সংগ্রামের বর্ণনা ও পর্যালোচনা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এই প্রকাশনায় লেখক ও সংকলকদের ভিন্ন ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমাহার ঘটল। কিছু ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও গভীর অনুশীলনের ছাপও ফুটে উঠল। কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর জীবন ও কর্মের মূল্যায়নও করা হল।[৬] 'অন্বেষা'য় 'বিজ্ঞান ও ইতিহাসবিদ' শীর্ষক রচনায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে মূল্যায়ন করলেন[৭] তা অবশ্যই বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে বিরল ও ব্যতিক্রমী—"...বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা যে

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি....চর্চারত প্রথম সক্রিয় বিজ্ঞানী রূপে তিনি একাজে এগিয়ে আসেন.....

"বিজ্ঞানকে শুধুই ইউরোপীয় ব্যাপার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা একদিকে, অন্যদিকে.....সংকীর্ণ জাতি অভিমান দ্বারা চালিত হওয়া—এই দুই -এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি বিজ্ঞানকে বহুজাতির বহুকালের অবদানে পুষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মূলস্রোত হিসেবে দেখার মধ্য দিয়ে প্রকৃত বিজ্ঞান - ইতিহাসবিদের মানসিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন....."

এসবের সঙ্গে সমালোচনাও জুটল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে চরকার মত 'মধ্যযুগের ধ্বংসাবশেষ' কে সমর্থন করতে পারেন নি, সেখানে একজন অগ্রণী বিজ্ঞানী হয়েও কেমন করে তিনি স্ববিরোধিতার শিকার হলেন, চরকার সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারলেন, একথা উল্লেখ করে লেখা হল[৮]— "অর্থনৈতিক বিকাশ আর উৎপাদন-সম্পর্কের অমোঘ নিয়মে বিশ্বব্যাপী যন্ত্রযুগের সূত্রপাতের পর চরকাকে আর পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়—একথা ভেবে দেখার মানসিকতা তাঁর ছিল না।.....তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা আর কর্মোদ্যোগের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ ছিল। তবে সেই দ্বন্দে তিনি প্রধানত যে 'নাট্যমঞ্চের অনুরাগমূর্তি'র (Idol of theatre) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁর বিজ্ঞানচেতনা আচ্ছন্ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।"

নাটমঞ্চ বলতে এখানে ভারত এবং তার আইডল বলতে গান্ধীজীকে বোঝানো হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড ও অন্যান্য খেতাব পাওয়া নিয়ে এবং তিনি কেন রবীন্দ্রনাথের মত নাইটহুড ত্যাগ করলেন না, তা নিয়ে প্রচুর জল্পনা হয়েছে, কটাক্ষও কম করা হয়নি। 'সরকারী খেতাব ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' শীর্ষক এক বিবৃতিতে[৯] 'অন্বেষা'য় লেখা হল—"আমাদের মনে হয় তাঁর বিজ্ঞানী-সত্তা আর দেশপ্রেমী সত্তার মধ্যে ঔপনিবেশিক বাস্তবতাজাত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি হয়তো ভাবতেন যে খেতাব ত্যাগ করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করা হবে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে বাধা আসবে।....সরকারী সহায়তা একেবারে না পেলে বৈজ্ঞানিক কাজই করা যাবে না। উপযুক্ত কোন বিকল্প ব্যবস্থারও অস্তিত্ব ছিল না। তাই সম্ভবত তিনি একটা আপস রফা করে নিয়েছিলেন ঃ সরকারকে না চটিয়ে, বিজ্ঞান-গবেষণার কাজে বাধার সৃষ্টি না করে যতটা পারা যায় দেশের সেবা করা।.....ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন স্বদেশী বিজ্ঞানসাধকের পক্ষে এই দ্বন্দ্বে পীড়িত হওয়া এবং খানিকটা আপস করা খুবই স্বাভাবিক। এবং যেহেতু প্রফুল্লচন্দ্র কোন অবস্থাতেই তাঁর ব্যক্তিগত কোন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করেন নি, তাই অন্যান্য C.I.E, স্যার, রায়বাহাদুর প্রমুখের সঙ্গে তাঁকে কোনমতেই একাসনে বসানো যায় না।"

আর একটি প্রফুল্ল মূল্যায়নের কথা বলব। নৈহাটি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড কালচার-এর মুখপত্র 'বিশ্লেষণে' 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কিছু ভাবনা' শীর্ষক রচনায়[১০] ধ্রুব রায় লিখলেন—"আচার্য রায় বিজ্ঞান-বিমুখ দারিদ্র কন্টকিত ধর্মের গোঁড়ামি ও জাতপাতে বিশ্বাসী অসংখ্য মানুষের মনকে অলৌকিক স্বপ্নদর্শন থেকে উদ্ধার করার কাজ করেছিলেন.....একজন বৈজ্ঞানিকের সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা পালন করতে চেষ্টা করেন.....

....এই আধুনিক বিজ্ঞানী কি করে গান্ধীজির চরকা-প্রস্তাবে সমর্থন করেন এটা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।" 'অন্বেষায়' প্রকাশিত বনবিহারী চক্রবর্তীর সমালোচনা প্রতিধ্বনিত হল শ্রীরায়ের লেখনীতে—"যদিও তিনি বিজ্ঞনচেতনা (ও) কর্মোদ্যোগের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ছিল তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।..... অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কগুলি খুঁটিয়ে দেখে তার আলোকে শ্রমবিমুখতার উৎস বের করে দেখানো তাঁর জীবনে হয়ে ওঠে নি।"

যে তিনটি মূল্যায়নের কথা বললাম-পার্থ সেন, বনবিহারী চক্রবর্তী এবং ধ্রুব রায় কৃত —পৃথকভাবে তাঁরা তিনটি পত্রিকায় লিখেছেন একদশক সময়ের বিস্তারে এবং তিনটি ক্ষেত্রেই মূল সুর একই। হ্যাঁ, মানুষটি গুণী ছিলেন ঠিকই-সৎ, দেশপ্রেমিক, নিষ্ঠাবান, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ বিজ্ঞানী ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু..... এক বিরাট 'কিন্তু' এসে তিনজনেরই দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়েছে—কেউ বলছেন, প্রফুল্লচন্দ্রের 'শিল্পবিকাশ চিন্তার সীমাবদ্ধতা' ছিল, কেউ

ইতিহাসে এমন আর একটি ঘটনারও যদি উল্লেখ করতেন তিনি! রচনাটি যে এক বিশেষ সময়ে বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে, মুর্ত্তিভাঙার বিশেষ কার্যক্রমকে উৎসাহ দেবার জন্যই লেখা, তা গোপন করেন নি শশাঙ্ক। একজন বিশেষ রাজনৈতিক কর্মীর ক্রোধ যে এভাবে একজন অরাজনৈতিক বিজ্ঞানীর উপর বর্ষিত হয়েছিল—এটা পরোক্ষে প্রফুল্লচন্দ্রের গুরুত্বই তুলে ধরে।

যাই হোক, আরও বিশদে না গিয়ে দু-একটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। শশাঙ্ক প্রফুল্লচন্দ্রকে (এবং তাঁর আদর্শকে) নস্যাৎ ও ধ্বংস করতে চেয়েছেন। যুবসমাজের উপর তাঁর ক্ষতিকারক প্রভাব যাতে না পড়ে তার তাত্ত্বিক রসদ যোগানোর প্রয়াস পেয়েছেন, অথচ তা করতে গিয়ে তিনি সমগ্র প্রফুল্লচন্দ্রকে চিনে ফেলেছেন একটিমাত্র গ্রন্থ 'আত্মচরিতের' আয়নায়। তাও আবার আত্মচরিতে কি বলা হয়েছে, তার ভিত্তিতে যত না তার চেয়ে বেশী যা বলা নেই তারই ভিত্তিতে! সোভিয়েত ইউনিয়ন বা শ্রমিক-কৃষকের কথা নেই, কাজেই প্রফুল্লচন্দ্রকে কি করে সহ্য করা যায়? কিন্তু কৃষকের কথা 'আত্মচরিতে' নেই একথা বলা সত্যের একটু অপলাপই। ২৪ ও ২৫ তম পরিচ্ছেদে '১৮৬০ ও তৎপরবর্তীকালে বাংলার গ্রামের আর্থিক অবস্থা' এবং 'বাংলার তিনটি গ্রামের আর্থিক অবস্থা', শীর্ষক ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা[১৩] তাহলে কাদের নিয়ে? অবশ্য শশাঙ্ক যেটুকু দেখতে চান যেভাবে দেখতে চান ঠিক সেইভাবে হয়তো প্রফুল্লচন্দ্র বলেন নি। কিন্তু কৃষি ক্ষুদ্রশিল্প কুটির শিল্প মিলিয়ে সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার যে পর্যালোচনা করেছেন, কৃষকের শোষণের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণে যে গবেষণা করেছেন—যেসবে শশাঙ্কের কোন রুচি নেই, এটাই আশ্চর্যের!

'বৈপ্লবিক কর্মচেষ্টায় আচার্য রায়ের সহানুভূতি-অনুপ্রেরণার' যে কথা জ্ঞান ঘোষ লিখেছেন সেটি 'আত্মচরিতের'ই ওরিয়েন্ট সংস্করণে যুক্ত [১৪] 'আচার্য আমার' প্রবন্ধে পড়েছেন শশাঙ্ক, অন্য কোথাও নয়। আর তাতেই ঝলসে উঠেছে তাঁর ধিক্কারবাণী—'বিড়ালতপস্বী গুরুদেবের যোগ্য শিষ্যের'—অসীম 'মিথ্যাচারের' মুখোশ ছিঁড়ে দিলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, যখন দেখি উদ্ধৃত লাইনটির পরবর্তী লাইনেই জ্ঞান ঘোষ লিখেছেন, 'আচার্য রায়ের আবাসস্থল সায়েন্স কলেজ হইতে গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা যাত্রা ইহার একটি দৃষ্টান্ত'। এটি কু-দৃষ্টান্ত, শৈলেন ঘোষ নামক কোন বিপ্লবীর অস্তিত্বই ছিলো না, ইত্যাকার কোন যুক্তি বা অযুক্তি হাজির করা তো দূরস্থান, শশাঙ্ক এ লাইনটার কথাই বেমালুম চেপে গেলেন! আরও বহু জায়গায় বহু মানুষ বিপ্লবীদের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের 'সহানুভূতি অনুপ্রেরণার' কথা উল্লেখ করেছেন, শশাঙ্কের সে সবে কোন আগ্রহ নেই।।

বৃটিশের পা-চাটা দালাল ইত্যাদি বিশেষণে প্রফুল্লচন্দ্রকে বিভূষিত করার জন্য 'আত্মচরিতে' বলা এবং না বলা কল্পনাই শশাঙ্কর যথেষ্ট। এই প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২২-এর উত্তরবঙ্গ বন্যার জন্য সরকারকে দায়ী করে তীব্র ভাষায় বলেন, 'ইচ্ছাকৃত এই অপরাধের জন্য দায়ী এই সরকার'[১৫]। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা বোঝার চেষ্টার সময় নেই শশাঙ্কদের। সততা ও সত্যনিষ্ঠায় যিনি অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশী স্থিত সেই প্রফুল্লচন্দ্রের কথাই শোনা যাক না একবার—"শিশুসুলভ সরলতার সহিত আমি ভাবিতাম যে ভারতের দুঃখদুর্দশার কথা যদি ব্রিটিশ জনগণের গোচরে আনা যায় তাহা হইলেই সেগুলির প্রতিকার হইবে। আমার এই মোহভঙ্গ হইতে বেশী দিন লাগে নাই।"[১৬]

একথা সত্যি যে প্রফুল্লচন্দ্র বিপ্লবী ছিলেন না। সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ—শশাঙ্কদের চোখে। ব্রিটিশ-শাসন বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও অন্ধবিদ্বেষীও তিনি ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জ্ঞানের আলোও যে ব্রিটিশদের সঙ্গে এদেশে পৌঁছেছিলো তা তিনি বলতেন।.... এবং জোরের সঙ্গে বলেছেন, পাশ্চাত্যের 'নিপুণতা কর্মতৎপরতা, একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা' থেকে আমাদের শিখবার আছে।[১৭] বারে বারে প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রাদেশিকতার অপবাদ সইতে হয়েছে। কিন্তু শশাঙ্ক সেটিকে আর নিছক অপবাদের জায়গায় রাখেননি। এখানেও, আমার মনে হয়, প্রফুল্লচন্দ্র যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন, তাই তাঁর অন্তর থেকে বেরোনো সত্য। 'নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ভারতীয় না বলে বাঙালী বলতে বাধ্য হয়েছি।...এটা তো মোটের উপর ঠিকই যে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতের যে কোন প্রদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'[১৮]

আর একথা তো ভুললে চলবে না যে দুখণ্ডে রচিত

ইংরেজী আত্মজীবনী তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের যুবশক্তির উদ্দেশ্যেই।

প্রফুল্লচন্দ্রের 'শ্রেণীচরিত্রের' উৎস সন্ধান বেশীদূর করেন নি শশাঙ্ক। রচনায় একবার মাত্র 'জমিদারনন্দন' বলে কটাক্ষ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। হয়তো বা তা এজন্যই যে স্বয়ং কার্ল মার্কস বা নকশালবাড়ী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চারু মজুমদারও কোন কৃষক বা শ্রমিকের সন্তান ছিলেন না।

শশাঙ্কর মত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একজন খাঁটি প্রবক্তার মূল্যায়নের নিরিখে অবশ্যই বলা যায় যে প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার লেশমাতত্র ছিল না।... প্রফুল্লচন্দ্রকে ব্যক্তিস্বার্থান্বেষী বলার মত দুঃসাহস দেখানো বুঝি বা শশাঙ্কর পক্ষেই সম্ভব।

বিজ্ঞান-নিষিক্ত জীবন বোধ

আমি আগেই বলবার চেষ্টা করেছি, কি অর্থে আজকাল আমরা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বলে থাকি। এই বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ কিছুই বলেন নি। তবে একধরনের বিজ্ঞানবোধের কথা তিনি বলেছেন, 'আমি বিজ্ঞানকর্মী, দেশের ছেলে মেয়েকে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানবোধ সম্পন্ন করতে পেরে থাকি যদি কিছুটাও তাহলে সেইটুকু আমার সাফল্য। এর বাইরে সাহিত্য হোক, রাজনীতি হোক সে সবই আমার কাছে কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিকের কাজ।'[১৯]

তাঁর এই বিশিষ্ট ও স্বকীয় বিজ্ঞানবোধ —যা কোনো বিশেষ রাজনীতির রং-এ রঞ্জিত নয়, যা মতাদর্শগত কৌলিণ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, যা তাঁকে জীবনভর কৌতূহলী ও প্রশ্নশীল করে রাখে, সৎ ও বিবেচক মানুষ হিসেবে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ করে চলে, যাকে তিনি জীবনচর্চার মাধ্যমে, অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন এবং প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে—শিক্ষকতায় গবেষণায় শিল্পস্থাপনে ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চায় সমাজসেবায় সেটা কি আমাদের বিজ্ঞান মনস্কতার ধারণার সঙ্গে মেলে?

এই মানুষটিকেই আমাদের চিনে নেবার কথা ছিল। বিশেষ করে আমাদেরই। কারণ তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সেবা ততটুকুই করেছেন, যতটুকু প্রয়োজন ছিল এদেশের মানুষের সেবা ও উন্নতির জন্য। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে— ভারতীয় প্রতিভাকে পশ্চিম চিনিয়ে দিয়েছে তবে আমরা চিনতে পেরেছি— প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায় তার অবকাশ ছিল কমই। চিনে নেওয়ার অর্থ নিন্দা করা নয়, পুজো করাও নয়। অথচ আমরা আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসমত এগুলোই করেছি; অথবা, বড়জোর, দুই-এর মাঝামাঝি একটা ব্যালান্স করার চেষ্টা করেছি-এবং সবই করেছি অংশ দিয়ে সমগ্রকে ধরবার চালাকির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের সেই উপনিষদ-মথিত উক্তির— সমগ্রহীন অংশ ঘোর অন্ধকার, অংশবিহীন সমগ্র আরো ঘোর অন্ধকার—এর তাৎপর্য বুঝিনি বা বুঝতে চাইনি।

কখনোই বলতে চাই না যে প্রফুল্লচন্দ্রে কখনও কোন স্ববিরোধিতা, আপোষ বা মানবিক দুর্বলতা দেখা দেয় নি। তিনি অতিমানব ছিলেন এমন মনে করার যেমন কারণ নেই তেমনি এটাও মোটেই ঠিক নয় যে তিনি এমন কিছুই করে যাননি যা এতদিন পরেও আমাদের পথ দেখাতে পারে। মানুষ মাত্রেই বহুমাত্রিক। প্রফুল্লচন্দ্র আরো বেশী করেই বহুমাত্রিক মনুষ্যত্বের সাধনা করেছেন, তিনি অবশ্যই এক প্রতিভা। বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের পথের বাঁকে বাঁকে তিনি বিলিয়েছেন দেশের মানুষের সুখ সমৃদ্ধি চেতনাবিকাশের পথের হদিস।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানবোধ

'এদেশের নাম বিশ্বের বিজ্ঞানমনচিত্র হইতে মুছিয়া গেল'

এই বাক্যটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিষ্ট্রি', প্রথম খণ্ড থেকে নেওয়া। এটি পড়ে দুটি প্রশ্ন মনে হতে বাধ্য—এক, কোনো সময়ে তাহলে এদেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর বিজ্ঞানমানচিত্রে খোদিত ছিল—কোন সময়ে এবং কিভাবে তা ছিল? আর দুই, কিভাবেই বা তা মুছে গেল, কোন সময়ে? প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বইতে এই দুই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন।

হিন্দু রসায়নের (একটি) ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে [২০] একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 'Knowledge of Technical Arts and Dechine of Scientific Spirit', আশীষ লাহিড়ীর অনুবাদে[২১] ঐ অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি থেকে প্রশ্ন দুটির উত্তরের আভাষ পেতে পারি—

"করণকৌশলের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অবক্ষয়

...বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও বিতাড়নের পর ব্রাহ্মণরা নূতন করিয়া নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন.....জাতিভেদ প্রথা নূতন করিয়া আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। মনু পরবর্তী পুরাণকারদের প্রধান প্রবণতা ছিল পুরোহিত শ্রেণীকে গৌরবান্বিত করার দিকে। পুরোহিত শ্রেণী অতিশয় উদ্ধত ও আপত্তিজনক বোলচাল দিতে লাগিল। সুশ্রুতের মত ছিল শব ব্যবচ্ছেদ ব্যতিরেকে শল্যবিদ্যা শিক্ষা করা যায় না; তিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কিন্তু মনু এসকল মানিতে রাজী নহেন। তিনি বলিলেন, মৃতদেহ স্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ কলুষিত হইবে। তাই আমরা লক্ষ করি বাগভট্ট-এর পরবর্তী কাল হইতে শল্য-অস্ত্র ব্যবহার করার পথে বাধা আসিতে থাকে এবং শারীরসংস্থানবিদ্যা এবং শল্যবিদ্যার চর্চা লোপ পাইতে থাকে। কার্যত হিন্দুরা এ সকল বিদ্যা বিস্মৃত হয়। এই প্রকারে কামারশালে ঘর্মনিঃসরণ করাও মর্যাদাহানিকর বলিয়া গণ্য হইল.... কার্য এবং কারণের সমন্বয় কি করিয়া সাধন করা যায়, সে সকলের বোধ, এককথায় অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। ভারতবর্ষ তখনকার মতো পরীক্ষানির্ভর ও বিশেষ ঘটনা হইতে সামান্য সিদ্ধান্তমূলক (inductive) বিজ্ঞানকে বিদায় দিল। ভারতের মাটি একজন বয়েল, একজন দেকার্তে বা একজন নিউটনের জন্ম দেওয়ার পক্ষে মানসিকভাবে অক্ষম হইয়া রহিল। এদেশের নাম বিশ্বের বিজ্ঞানমানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল।....'

এমনিতে সাবলীল ও সুখপাঠ্য হলেও শ্রীলাহিড়ীর বঙ্গানুবাদের দু-একটি জায়গায় আমার খটকা লেগেছে। প্রথমত, Knowledge of technical arts-এর বাংলা তর্জমা তিনি করেছেন---করণকৌশলের জ্ঞান। 'করণকৌশল' যা কিনা নিম্নবর্গের বৃত্তিগুলির সঙ্গে জড়িত। এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেগুলিরই আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে। সেগুলি হল ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয় তো বটেই সেই সঙ্গে ধাতু-অলঙ্করণ, হস্তিদন্ত খোদাই, কলাই করার কাজ, রঞ্জন, সীবন, স্বর্ণালঙ্কার ও মণিকারের কাজ ইত্যাদি। এইসব 'হস্তশিল্প শ্রেণীর লোকেরাই' হলেন করণকুশলী। তাহলে এই খটমট শব্দ ব্যবহার না করে শ্রীলাহিড়ী সোজাসুজি বলতে পারতেন, 'কলা-কৌশলের জ্ঞান' বা 'কলা-কুশলীর জ্ঞান'। এমনকি মিস্ত্রি কারিগরদের কর্মকুশলতা বা বা কলাকুশলতা বললে কি আরো সহজবোধ্য হতো না? দ্বিতীয়ত, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ, তিনি Scientific Spirit এর বাংলা করেছেন 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা'। অন্যত্র, ঐ প্রবন্ধেই একই রকম অর্থে 'বিজ্ঞানমনস্কতাও' ব্যবহার করেছেন। প্রশ্ন হ'ল প্রফুল্লচন্দ্র যাকে বলেছেন Scientific Spirit, তা কি পরবর্তীকালে ব্যাপক ব্যবহৃত 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' বা 'বিজ্ঞানমনস্কতার' সঙ্গে অভিন্ন? ইংরেজী শব্দবন্ধ Scientific temper বা temperament, attitude, awareness ইত্যাদি এবং প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যবহৃত Scientific spirit কি সমার্থক? শ্রীলাহিড়ী নিজেও তো উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই লিখেছেন 'সে সকলের বোধ, এককথায় অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, (Spirit of enquiry) তাহলে Scientific spirit কে বাংলায় 'অনুসন্ধান প্রবৃত্তি' বলাই কি যথাযথ? নাকি একে আমরা 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা' বলব? অথবা আরও ভালো সম্ভবত, 'বৈজ্ঞানিক অন্তরাত্মা' বা 'বিজ্ঞান-অন্তরাত্মা'? তাহলে Knowledge of Technical Arts and Decline of Scientific spirit -এর বাংলা হতে পারতো—'মিস্ত্রি কারিগরদের কলাকুশলতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অবক্ষয়' অথবা 'কলাকুশলীরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান-অন্তরাত্মার মৃত্যু/ক্ষয়প্রাপ্তি/অবক্ষয়'। আমার মনে হয় এরকমটি হলেই প্রফুল্লচন্দ্র আরও স্পষ্ট ও যথাযথভাবে ধরা দিতেন।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তথা বিজ্ঞানমনস্কতার তত্ত্ববিলাসী প্রচারক ও বিশ্লেষকরা সচেতনে বা অবচেতনে এর সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনকে সম্পৃক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর। 'আত্মা বা অন্তরাত্মা' শব্দে তাঁদের অ্যালার্জি থাকতেই পারে, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রকে সেই দলে ফেলা যায় না। অতীত ভারতে (প্রাচীন কাল থেকে সপ্তদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত) বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে 'প্রাণময়তার'[২২] পেছনে তিনি যেমন 'প্রকৃতিকে প্রশ্ন করা অর্থাৎ সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের' গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন, কণাদ -দর্শন তথা কণাবাদের এবং চার্বাক দর্শনের অনুকুল প্রভাবের কথা বলেন, এবং সেই প্রাণময়তার অবক্ষয়ের পেছনে শঙ্করের

বেদান্ত তথা মায়াবাদের ভূমিকাও দেখতে পান, তেমনি নিজের রচনার মধ্যে অনায়াসে লেখেন, 'উভয়েই বিজ্ঞানদেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন'[২৩] (মেরী ও পিয়ের কুরি সম্পর্কে), অথবা 'রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার বিধান বলে আমার মনে হয়'।[২৪]

হাত আর মগজের সমন্বয়

ফরাসী বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ মার্সেলিন বার্থেলোই (Berthelot) প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু রসায়নের ইতিহাস লেখার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। বার্থেলোকে তিনি হিন্দু কিমিয়াবিদ্যার (Alchemy) একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে পাঠানোর সময় 'রাসেন্দ্রসারসংগ্রহ' নামক পুঁথির উপরই ভিত্তি করেছিলেন। কিন্তু আসল কাজে নেমে আবিষ্কার করলেন, 'রাসেন্দ্রসারসংগ্রহ' ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা তিনি আগে ভেবেছিলেন। এবিষয়ে দুটি প্রামাণ্য আকরগ্রন্থ হলো, ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত —রামচন্দ্রের 'রসেন্দ্রচিন্তামনি' এবং যশোধরের 'রসপ্রকাশসুধাকর'। দুটি গ্রন্থেরই লেখকরা বলেছেন, নিজেরা পরীক্ষা করে যা কিছু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন, কেবলমাত্র সেইসবই তাঁর লিপিবদ্ধ করেছেন। অপরীক্ষিত বা নিজেরা যা সম্পাদন করতে পারেন নি, সেইসব বিষয় তাঁরা সযত্নে বাদ দিয়েছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজেও সেকথা কোন সময়ে বিস্মৃত হননি। হিন্দু তথা ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি পুঁথির হদিস ও মর্মোদ্ধার করেই ক্ষান্ত হতে পারেন নি। বিভিন্ন কলা ও কৌশলের হদিস পেতে হয়েছে অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীরা এইসব বিদ্যাকে তাঁদের নিজস্ব ট্রেড সিক্রেট হিসেবে গণ্য করেন। এইসব ট্রেড-সিক্রেটের গোপনীয়তার বর্ম ভেদ করে তিনি ও তাঁর ছাত্ররা সেগুলিকে আবার পরীক্ষাগারে যাচাই করে দেখেছেন। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের নিরিখে অন্তর্নিহিত রাসায়নিক পরিবর্তন তথা বিক্রিয়াগুলিকে চিহ্নিত করেছেন এবং যেখানে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি সেখানে তা উল্লেখ করেছেন। এইভাবে তিনি আধুনিক জ্ঞান ও মননশীলতার সঙ্গে কলাকুশলীর চর্চার মেলবন্ধন ঘটনানোর আশ্চর্য সব নিদর্শনও তুলে ধরলেন তাঁর বইতে। একজন 'সক্রিয়' রসায়নবিদের ইতিহাস অনুসন্ধানের এই মৌলিক প্রক্রিয়ার হদিস পেতে 'অলঙ্কার প্রস্তুতিতে বাংলায় সোনার অপচয়' (Wastage of gold in the course of preparing Jewellery in Bengal) শীর্ষক অংশটি পড়ে দেখা যেতে পারে।....

বাজার এবং ব্যবসা, স্বর্ণালঙ্কার শিল্পে জড়িত মানুষজনের সংখ্যা ইত্যাদিরও সমীক্ষা করে ফেলেছিলেন এই সূত্রে। বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শহর কলকাতায় প্রতিদিন পড়ে ৭৫০ তোলা স্বর্ণালঙ্কার প্রক্রিয়াকৃত হয়। এর মধ্যে থেকে অন্তত ২৩তোলা সোনা 'জমক' দ্রবণে দ্রবীভূত অবস্থায় অপচিত হয়। 'যন্তকওয়ালারা' তাদের অসংস্কৃত পদ্ধতিতে বড়জোর ১৩ তোলা পরিমাণ উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি একটি যথোপযুক্ত রসায়নাগারের সহায়তা পেতেন, যদি আধুনিক রসায়ন জ্ঞানের সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার কারিগরদের গাঁটছড়া কাজ করতো তাহলে ঐ অবশিষ্ট সোনাটুকুরও অন্তত তিন চতুর্থাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হতো, কম সময়ে এবং সহজে। এতে বছরে ১৫-১৬ লক্ষ টাকার সোনা অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতো।....

আজ শতাধিক বছর পার হয়ে এসে এ কাজের গুরুত্ব আরও বেশী করে উপলব্ধ হবার কথা। অপচিত সোনার দামই তিনি শুধু হিসেব করেছিলেন। দূষণ হিসেবে তিনি একে দেখেন নি। আজও কলকাতার বিশেষ বিশেষ জন অধ্যুষিত এলাকায় (যেমন শাঁখারিপাড়ায়) বিশাল বিশাল অট্টালিকার খুপরি খুপরি ঘরে প্রফুল্লচন্দ্র বর্ণিত পদ্ধতিতেই কাজ চলেছে। পুরনো স্যাঁৎসাঁতে অন্ধকার বাড়িগুলির অধিবাসীরা অধিকাংশই উৎখাত হয়েছেন। কিন্তু ক্লোরিন অ্যাসিড বাষ্প নাইট্রোজেন অক্সাইডের ধোঁয়ার মানবশরীরে ধ্বংসলীলা অব্যাহত অপ্রতিহত আজও। প্রফুল্লচন্দ্রের দেওয়া সূত্র অনুসরণে আমরা স্বর্ণালঙ্কার শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারতাম। একটি স্বর্ণশিল্পগ্রাম বা ঐজাতীয় ক্লাস্টারে সবার জন্য ল্যাবরেটারী এবং দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতাম, আরও বহু নতুন নতুন ক্ষেত্রে এরকম ভাবনার, হাত ও মাথার, কৃৎকৌশল ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন জরুরী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা পারিনি। আমাদের বিজ্ঞান মনস্কতা তো প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানবোধের মত নয়!

যাই হোক, 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রিতে প্রফুল্লচন্দ্র

বিজ্ঞানচর্চার জন্য অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি এবং ভাব-পরিমণ্ডলের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রেখেছিলেন তাতে তাঁকে, ভারতে তো বটেই, সারা বিশ্বেই একজন পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করতে হয়। তাঁর অনেক পরে ফ্যারিংটন বার্ণাল নীডহ্যাম প্রমুখরা বিজ্ঞান ও সমাজের মিথস্ক্রিয়া চর্চার অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন। আজ তাই পশ্চিমের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা নামে বিষয়টির চর্চা হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের গুরুত্ব না অনুধাবন করায় আমরা যেমন এ বিষয়ের চর্চা তেমনভাবে ধরে রাখতে পারিনি, তেমনি আন্তর্জাতিকভাবেও প্রফুল্লচন্দ্রের জন্য পথিকৃতের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারিনি। আধুনিক ভারতীয় জীবনে আমদানীকৃত বিজ্ঞান প্রযুক্তির স্বীকরণেও আমরা তাই ব্যর্থ হয়েছি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি ডেকে আনছে।

পিছু হঠানোর দর্শন

তৎকালীন সমাজের প্রচলিত প্রবলতর দার্শনিক মতবাদ ছিল শঙ্করের বৈদান্তিক মতবাদ। ইতিহাসের তথ্যের আলোয় আলোকিত প্রফুল্লচন্দ্র স্রোতের বিপরীতে হেঁটে, যা তিনি সত্য বলে মনে করেছেন তা নির্ভীকভাবে তুলে ধরতে পিছপা হননি। তিনি লিখলেন, 'শঙ্কর কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত বেদান্তদর্শন এই শিক্ষা দেয় যে বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নাই। ভৌত বিজ্ঞানের চর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মূলে এই দর্শনও বহুলাংশে দায়ী।'[২৫]

হিন্দু রসায়নের ইতিহাসকারের আত্মপ্রত্যায় ও বিজ্ঞানবোধের শ্রেষ্ঠ জনবোধ্য প্রকাশ বোধ হয় ঘটেছিল 'The Bengali Brain and its Misuses' শীর্ষক ইংরেজী রচনায়' [২৬] পরে যার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' প্রবন্ধের[২৭] মাধ্যমে। 'বাঙালীর মস্তিষ্ক' থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা যাক।

"প্রাচীন ভারতে কেবল যে দর্শন ও সাহিত্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন নহে! আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রেরও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ সমস্ত বিদ্যা কি প্রকারে লোপ পাইল?....

"উপনিষদ রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত এই সময় মধ্যে হিন্দুর মস্তিষ্ক চালনা বা মানসিক চিন্তার যাহা কিছু গৌরব করিবার তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সময় অর্থাৎ খ্রীস্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব হইতে ৭০০ খ্রীষ্টিয় অব্দ পর্যন্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতি বা স্বাধীন চিন্তার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সময়েই পানিনি সাহিত্য জগতে অতুলনীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।....

"বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল।.....স্বকীয় জাতির মহিমা হারাইয়া, কেবল এক গুচ্ছ শ্বেতশুভ্র যজ্ঞোপবীতের দোহাই দিয়া সমাজের শাসন বিষয়ক স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল।.....

"বস্তুত ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তি একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হইল। যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আভাষ জাতীয় শিল্প ও জ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে কিছু প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদি আলোচনার আভাষ সূচিত হইয়াছিল, তাহা অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হইবার পথে আসিল।..."

"যখনই স্বাধীন চিন্তা বিচারশক্তি ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, চরিত্রমধ্যে যখন স্বীয় অভিমত পোষণ করিবার সাহস চলিয়া যায়, তখন পরের গ্রাসে আহার করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে।....

"এককালে ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াছিল স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের দ্বারা। আবার যদি ভারতের উন্নতি হয়, তবে তাহাও স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের অনুষ্ঠান দ্বারাই হইবে।....হারবার্ট স্পেনসার বা শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন বলিয়াই কোন কথা মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে। নিজের যুক্তি ও বিচারের দ্বারা উহার যথার্থ্য প্রমাণিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই স্বাধীন চিন্তার মূল সূত্র।...."

প্রফুল্লচন্দ্র 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' বা 'বিজ্ঞানমনস্কতার' ধার করা বুলি কপচান নি; স্বকীয়তার মণ্ডিত তাঁর বিজ্ঞানবোধ লেখনিতে স্বতোৎসারিত হয়েছে, স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গলকামনায়, কখনো তা প্রগলভ ক্রুদ্ধ কখনো বা বেদনবিধুর :

"আমি সত্যের সন্ধান চাই। কিসে পাব; এই সে দেখা

দেবে। পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে। এই খোঁজের খেলায় বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হয়ে থাকতে চাই।.... আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে...."[২৮]

পশ্চিমী মাপকাঠিতে বড়ো বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একাসনে তাঁকে ঠাঁই দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে আমরা যখন তর্ক-ঝগড়ায় প্রবৃত হই তখন আমাদের মনে করা উচিত প্রফুল্লচন্দ্রেরই উক্তি, 'আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে'।

প্রফুল্লচন্দ্র শঙ্করাচার্য ও তাঁর মায়াবাদকে 'বহুলাংশে দায়ী' করেছেন এদেশে বিজ্ঞানচর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু তাই বলে তাঁরই সমসাময়িক (বছর দুই-এর ছোট) 'বৈদান্তিক' সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের উচ্চকণ্ঠ প্রশংসায় তিনি পরাঙ্মুখ হননি।[২৯] অবশ্যই ক্ষেত্র বিচার করেছেন। তিনি মনে করতেন, বিবেকানন্দের পুরোহিত ঘৃণা, সামাজিক অত্যাচার বিরোধিতা, শূদ্র-উত্থানের আহ্বান এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বার্তা ('বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ যুক্ত আদর্শ ভারত') দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।[৩০]

আজীবন অনুসন্ধিৎসা, স্বাধীন চিন্তা, নিজ অভিমত পোষণ করার সাহস, তথ্য ও যুক্তির দ্বারা বিচার করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা, পক্ষপাতহীন এবং 'সহজবুদ্ধি'র (Common Sense) আকর প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান ইতিহাস সমাজ দর্শন সাহিত্য সর্বত্র তাঁর বোধ নিয়ে অবাধে বিচরণ করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানবোধ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হবার বোধ। স্যার হামফ্রি ডেভি'র কাছে মাইকেল ফ্যারাডে নামক এক 'অশিক্ষিত' যুবক হাজির হয়েছিলেন ল্যাবরেটারিতে যে কোন কাজ করার সুযোগ দেবার আর্জি নিয়ে। বই বাঁধাই-এর দোকানে কাজ করেন ফ্যারাডে। ফ্যরোডের উচ্ছ্বাস দেখে ডেভি প্রথমে নিরস্ত করতে চাইলেন, বললেন—বিজ্ঞান এক নির্দয় প্রেয়সী (Science is a hard mistress), বুঝলে ছোকরা! ফ্যারাডে পরে সেই নির্দয় প্রেয়সীর কাছে পৌঁছেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রও সেই নির্দয় প্রেয়সীকে নিয়েই চুরাশি বছরের মানবজীবনকে প্রাণচঞ্চল রাখতে পেরেছিলেন। তাঁকে 'বিজ্ঞানমনস্ক' বললে আমরা আমাদের মাপেই ছোট করে ফেলব। ফেলেছিও।

নয়া ব্রাহ্মণ্যবাদ

প্রফুল্লচন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ কবলিত হয়ে ভারত একদিন সঙ্কীর্ণতার পাঁকে পড়েছিল, জাত-পাত ভেদভাবে জর্জরিত হয়েছিল, স্বাধীন চিন্তার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল, কাজের হাত আর চিন্তার মগজের বিচ্ছিন্নতা এনেছিল এবং এসবের ফলশ্রুতিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ভারতভূমি থেকে। কিন্তু যুগে যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের রূপ পাল্টায়। আমরা দেখালাম এক নতুন রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ্যবাদ। সামাজিক লক্ষণগুলো একই রকম। কৌলিণ্যের আস্ফালন, আপ্তবাক্য আশ্রয়, দুর্বল-পেষণ, প্রবল পক্ষপাত, গুণগ্রাহিতার দৈন্য, স্বাধীন চিন্তার ভীতি এবং আনুষঙ্গিক আর যা কিছু বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের পরিপন্থী। যেখানে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট 'বিজ্ঞানমনস্কতা'র প্রবল উপস্থিতি কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের 'বিজ্ঞানবোধে'র ঠাঁই নেই। 'সবই ব্যাদে আছে'র মত 'সবই বিজ্ঞানে অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞানের দর্শনে আছে'র মত এক ঘোর সঙ্কীর্ণ বিজ্ঞানবাদ (Scientism) আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১। 'যোজনা', ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩,

২। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

৩। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', মে-জুন, (সপ্তমবর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা), ১৯৮৪

৪। 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), পার্থ সেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই আগষ্ট। ১৯৮১

৫। অন্বেষা, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৫

৬। ঐ, 'ভারতে আধুনিক রসায়নচর্চা ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আশীষ লাহিড়ী (সংকলন ও গ্রন্থনা)

৭। ঐ, মূল ইংরেজী থেকে সংক্ষিপ্তকরণ ও অনুবাদ, আশীষ লাহিড়ী, পৃঃ ৪৫-৮৯

৮। ঐ, 'বিজ্ঞানীর চরকা-প্রীতি প্রসঙ্গে'-বনবিহারী চক্রবর্তী, পৃঃ ৪৩

৯। ঐ পৃঃ ২০ বিবৃতি বা রচনাটির লেখক হিসেবে কারও নাম নেই। এটি সম্পাদকীয় বিবৃতি হিসেবেই ধরা যায়।

১০। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কিছু ভাবনা—ধ্রুব রায়, বিশ্লেষণ, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৯

১১। দেশব্রতী, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭০ ('পত্রিকার দুনিয়ায়' কলামে শিরোনামহীন রচনা।)

১২। এবং জলার্ক, জানু-জুন, ২০০৩, পৃঃ ২৫০-২৫৪

১৩। 'আত্মচিরিত', লেখক 'আচার্য' ছিলেন না, ছিলেন 'প্রফুল্লচন্দ্র রায়', 'শৈবা প্রকাশন বিভাগ, ৬ষ্ঠ সং (২০১০) পৃঃ ৩০৬-৩৩০

১৪। 'আত্মচরিত', প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি (১৯৬১)

১৫। 'Life and Experiences of a Bengali Chemist', Vol.II, Chakraborty & Chatterjee, 1932, P-236 *(This Government is criminally and wilfully responsible for the flood')*

১৬। অন্ধজনে দেহ আলো, নিরুপম সেন, গণশক্তি ২ আগষ্ট ১৯৮৭, দ্রঃ প্রসঙ্গ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সম্পাঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌর সংস্থা (২০০৬)

১৭। সত্যের সন্ধান-প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দ্রঃ জাতিগঠনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রয়াস, দীপক কুমার দাঁ (সং ও সম্পা) ২০১১

১৮। 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ এক বিরল পূর্ণব্যক্তিত্ব'-পীযূষকান্তি রায় (দ্রঃ প্রসঙ্গ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসভা (২০০৬)

১৯। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত; 'স্মরণীয়দের সান্নিধ্য' গ্রন্থ থেকে অমলেন্দু ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ প্রফুল্লচন্দ্র রায়' (তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসংস্থা, ২০০৬)-এ সঙ্কলিত।

২০। A History of Hindu Chemistry (Vol. I), Bengal Chemical & Pharmaceutical Works (1902) and Vol. II. BCPW (1909) । বইদুটির কোন বাংলা অনুবাদ নেই। ভবেশ চন্দ্র রায় একটি সংক্ষিপ্ত বাংলারূপ করেছিলেন 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা' নামে। প্রফুল্লচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় সেটি দেখে দিয়েছিলেন। একটি পুস্তিকা হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৪৩)।

২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তকরণ ও অনুবাদ করেছিলেন শ্রী আশীষ লাহিড়ী। দ্রঃ 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ', 'অন্বেষা', প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা। নভেঃ ডিসে. ১৯৮৫, পৃঃ ৪৫-৪৯

২২। আশীষ লাহিড়ীর ব্যবহৃত শব্দ

২৩। ম্যাডাম কুরি, দ্র ঃ জাতিগঠনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রয়াস—দীপক কুমার দাঁ (সং ও সম্পা) দ্য সায়েন্স অ্যাসোঃ অফ বেঙ্গল, (২০১১)

২৪। সাধনা ও সিদ্ধি, দ্রঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড (৩য় সং), চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কো. লি. (১৯৩৮)

২৫। অন্বেষা, পূর্বোক্ত, আশীষ লাহিড়ীর অনুবাদ, পৃ. ৪৮

২৬। Bengali Brain and its Misuses. City Book Society, Calcutta (1910)

২৭। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা (১৯১০)

২৮। 'সাধনা ও সিদ্ধি' দ্রঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী,১ম খণ্ড. তৃতীয় সং (১৯৩৮)

২৯। বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কলিঙ্গনাথ ঘোষ, বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩১, দ্রঃ 'আত্মচরিত', প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রথম 'দে'জ সং (২০১১)

৩০। 'কোন বিবেকানন্দ? প্রফুল্লচন্দ্রের ইঙ্গিত', আশীষ লাহিড়ী, ফলা, দশম সংখ্যা, জানু ২০১২

* ১৬ জুন, ২০১২ 'চেতনা' (গণসাংস্কৃতিক সংস্থা) আয়োজিত তৃতীয় অমলেন্দু চক্রবর্তী স্মারক বর্ক্তৃতায় প্রদত্ত ভাষণ অনুসরণে রচিত।

চার বছর ধরে নিয়মি বেরোচ্ছে

দুর্বার ভাবনা

১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন ঃ ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০/৭৪৫১

ই-মেল ঃ sonagachi@sify.com, URL : www.durbar.org

কোলকাতা বই মেলায় স্টল নং ১৪৯

বিজ্ঞানচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ

অমূল্য মণ্ডল

"বিজ্ঞান সত্যকে প্রকাশ করে। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস (মানুষের) মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে।" —ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

বিজ্ঞান সত্যকে আবিষ্কার করলেই মানুষ কিন্তু তা গ্রহণ করে না বা করতে চায় না। কারণ আবিষ্কৃত 'নতুন সত্য' মানুষের প্রচলিত ধ্যান ধারণার ও আচার-আচরণে পরিবর্তন আনতে চায় যা রক্ষণশীল মানুষ বা সমাজ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। অথবা অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী সংশ্লিষ্ট মহল আখেরে নিজের লোকসান হতে পারে ভেবে বা ভুল চিন্তাভাবনার কারণে এর বিরোধিতা করে। বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও বিশ্লেষণ মানুষের চিন্তা-চেতনায় নাড়া দেয় যা মানুষকে বাস্তববাদী ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করতে পারে।

যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তা-চেতনায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আলোকপ্রাপ্ত সমাজ থেকে ও মানুষের মন থেকে দূর হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক ও অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা আজও বিভিন্ন অংশকে বিভ্রান্ত করছে, পেছনে টানছে। দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় হলো শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যেও এই ধরনের বিভ্রান্তি আজও প্রবল। এমন কি উচ্চ ডিগ্রীধারী তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, বিজ্ঞান চর্চা যাঁদের জীবিকা তাঁরাও দেখা যায় অসুখবিসুখে ও সাংসারিক নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ধর্মীয়গুরু, সাধুবাবার শরণাপন্ন হচ্ছেন ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ করেছেন। সঠিক বিজ্ঞান-ভাবনা ও মানবিক চেতনার দৈন্যের কারণে আজো সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতিভেদ ও বর্ণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ আধুনিক সমাজ-বন্ধনকে শিথিল করছে। শতাধিক বছর ধরে বহু মানবদরদী মহান ব্যক্তিবর্গ সমাজ থেকে এসবের কালোছায়া দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু অভিশাপমুক্ত হবার জন্য আমাদের এখনো অনেক পথ যেতে হবে সঠিক নিশানায়।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির অবদান আমরা নিত্যদিন উপভোগ করছি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতের শুতে যাবার আগে অবধি অসুখ বিসুখে ওষুধপত্র, দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা, ঢের ঢের ভোগ্যপণ্য ও বিলাসদ্রব্যাদি শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজে আমরা গ্রহণ করছি যা অন্যদের শ্রমে তৈরি ও বহুজনের পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের নাগালের মধ্যে আসে। অথচ আমরা এই 'অন্যদের' প্রতি থাকি উদাসীন। সমাজের অবদান দু'হাত ভরে গ্রহণ করি, আর ঋণ পরিশোধের প্রচেষ্টায় কৃপণ।

দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং সমাজের শান্তি ও সুস্থিতির জন্য সচেতন ভূমিকা পালন করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখবার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ও প্রতিটি সচেতন নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর ছোট বড় বহু দেশে রাজনৈতিক পালা বদল ঘটেছে, একটি শাসকদলের জায়গায় অন্য শাসকদল ক্ষমতায় বসেছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে বলীয়ান হয়ে দ্রুত গতিতে ধাবিত হচ্ছে 'উন্নয়নের' রথে চড়ে। রথের চাকায় পিষ্ট হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা, আবেগ, সহানুভূতিশীলতা, শিশুর শৈশব, মানুষের মনুষ্যত্ব। সমাজ হয়ে উঠছে হিংস্র, অশান্ত। কারণ সরকার ও শাসকশ্রেণীর উন্নয়নের দিশা ও বৃহত্তর সমাজের উন্নয়নের চাহিদার নিশানার গতিমুখ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা এমন এক "উন্নত" সমাজের দিকে ধাবমান যেখানে ধনীমানুষ আরো ধনবান ও গরীব মানুষ হয়ে পড়ছে কপর্দকশূন্য। কতিপয় মানুষের অতিমাত্রার লোভ, ভোগলিপ্সা, অর্থলোলুপতা ও সম্পদ সংগ্রহের বাসনা দেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে সমাজে স্থায়ী অন্ধকার যুগ ডেকে আনবার ভূমিকার নানাবিধ লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দূরদর্শন যন্ত্রটাকে এতদিন অনেকে সখ করে নাম দিয়েছিলেন "ইডিয়ট বক্স" যা এখন পরিণত হয়েছে ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে। দিনরাত এই সখের যন্ত্রটি ব্যবসাবাণিজ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে অপবিজ্ঞান ও অসত্য অর্ধসত্য ভাষণ চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

বিশ্ববাজার অর্থনীতির কল্যাণে একদিকে চলছে তথাকথিত উন্নয়নের একমুখী সর্বগ্রাসী অভিযান, অন্যদিকে অপসংস্কৃতির প্রচার চলছে সর্বক্ষণ, আর সংস্কারের মানে দাঁড়িয়েছে এসবের অংশীদার হওয়া। শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুরূপভাবে ঢেলে সাজানো চলছে। বিশ্বায়নের এই প্রাবল্যের মধ্যে আমাদের মত বিকাশশীল দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী চেতনা ও মানবিক বোধের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য সহযোগিতা করা সমাজ উন্নয়নের একটা সঠিক দিশা হতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার জানা নেই এই কাজ কিভাবে করা সম্ভব। কিছু কিছু বিজ্ঞান ক্লাব/সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, বা কিছু ব্যক্তি মানুষ শহরে, গ্রামে গঞ্জে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব চিন্তাভাবনা নিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করছেন। তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত ভাবে সমসাময়িক বিষয়গুলি তুলে ধরা খুবই জরুরী বলে মনে হয়। বহু প্রাতঃস্মরণীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ইতিমধ্যেই এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ করে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যেমনটি করেছেন রাজা রাম মোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

এই প্রেক্ষাপটে আরো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দার্শনিকের নাম উল্লেখ্য। তিনি হলেন মানবেন্দ্র নাথ রায় (আগের নাম নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য)। তাঁর জন্মের ১২৫ বছর চলছে। তিনি জার্মানী, রাশিয়া, চীন সহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে থেকেছেন, সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অনেক আলোচনা, কাজকর্মের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে দেশে এসে নতুন দর্শনের প্রস্তাবনা করেন—সক্রিয় মানবতাবাদ বা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট তত্ত্ব। সামাজিকভাবে বিজ্ঞান - প্রযুক্তির প্রকৃত সুফল পাবার জন্য বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধকে মেলাতে পারাটাই বোধহয় আমাদের আশু কর্তব্য।

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী

দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজস্ট্রিট),
পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড)
অমর কোলের স্টল (বিবাদী বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা)
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বই-এর স্টল

গ্রাহক চাঁদা — ১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ) কলকাতার বাইরে চেকের জন্য অতিরিক্ত ৩০ টাকা
পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১০১২৫৬৭

শক্তি : তিনটি চিত্র

রবীন ব্যানার্জি

এক ঃ খাদ্যশস্য খেয়ে নিচ্ছে জৈবজ্বালানী

জীবাশ্ম জ্বালানীভাণ্ডার সংকুচিত হতেই গোটা বিশ্ব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিকল্পের সন্ধানে, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ভূগর্ভস্থ তাপশক্তি, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার শক্তি, পরিবহন জ্বালানির জন্য সব ধরনের গাছ-পালা, ফুল-ফল, অনুসন্ধান চলছে সবার ওপর, চলছে পরীক্ষা-নিরিক্ষা। বিশ্ব উষ্ণায়ন, কিয়োটো প্রোটোকল, সর্বোপরি জীবাশ্ম জ্বালানির মুল্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্র নেতাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। পাশাপাশি বাজার অর্থনীতি, ফলে অপচয় বন্ধ করার ডাক দেবার ক্ষমতাও নেই। প্রায় বাধ্য হয়েই রাষ্ট্র নেতারা খাদ্যশস্য থেকে বায়োডিজেল, বায়োইথানল উৎপাদন করে পৃথিবীতে খাদ্য সংকট ডেকে আনছেন।

২০০৯-১০ সালে জৈব জ্বালানির উৎপাদন ছিল ১১৩ বিলিয়ন লিটার। বর্ত্তমানে প্রায় ৮২ শতাংশ ইথানল উৎপাদন হচ্ছে জৈব জ্বালানি হিসাবে। তার ৪০ শতাংশ আখ এবং বাকিটা ভূট্টা, গম, ও ভিন্নভিন্ন (ভোজ্য ও অভোজ্য) তৈলবীজ থেকে। আমেরিকা ২০১০ সালে ২৭০৭ মিলিয়ন লিটার বায়োডিজেল উৎপাদন করেছিল সোয়াবিন থেকে, ভূট্টার থেকে ৪৬০১৭ মিলিয়ন লিটার ইথানল। সে দেশে ভুট্টার থেকে হেক্টরে ৩৭০১ লিটার ইথানল উৎপাদন হয়। ১২.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ভুট্টার চাষ হয়েছিল ইথানলের জন্য। আমেরিকার কর্ণগ্রোয়ার এ্যাসোসিয়েশনের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ২০০৭-০৮ সালে গোটা বিশ্বের ভুট্টার উৎপাদন ছিল ৮৯ মিলিয়ন টন, তার ৯১ শতাংশ, ৮১ মিলিয়ন টন ব্যবহৃত হয়েছিল ইথানল উৎপাদনে। প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল বাজারে। ২০০৮ সালেই আমেরিকার লালগমের (U.S Hard Red Winter Wheet) দাম সর্বকালের উর্দ্ধে প্রতিটন 326 ডলার এবং হলুদ ভুট্টার (U.S. No. 2 Yellow Corn) দাম প্রতিটন ২২৩ ডলার হয়েছিল। সেই মূল্যবৃদ্ধির ঢেউ ভারত সহ গোটা বিশ্বেই আছড়ে পড়েছিল।

২০০৫—০৬ থেকে ২০০৮-০৯ চারটি অর্থবর্ষে কিভাবে খাদ্যশস্যের থেকে ইথানলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১নং সারণী থেকে বোঝা যাবে।

এখন সবদেশ আখের রস থেকে চিটেগুড় এবং চিটেগুড় থেকে ইথানল উৎপাদন করে। কিন্তু ব্রাজিল উৎপাদন প্রযুক্তির সম্রাট। আখের রস থেকে সরাসরি ইথানল উৎপাদন করে। উৎপাদন হেক্টরে ৫৪৭৬ লিটার। দুর্বল প্রযুক্তি নিয়ে চীন উৎপাদন করে ১৯৯৫ লিটার প্রতি হেক্টরে, তবে সেটা ভুট্টা থেকে। আভ্যন্তরিণ খাদ্যশস্যের সংকট দেখে চীন পরিবর্তন করছে জৈব জ্বালানি নীতি। ভুট্টাব বদলে গম, কাসাভা (CASSAVA), সারগম

সারণী -১

অর্থ বর্ষ/মিলিয়নটন

রাষ্ট্র	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯ **Projected**
আমেরিকা ভুট্টার থেকে	৪০.৭	৫৩.৮	৭৬.২	১০০.৪
সারগম থেকে	০.৬	০.৭	০.৬	১.৩
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৩.২	৩.৪	২.৯	৫.২
কানাডা	০.৭	১.৫	১.৮	২.৫
চীন	৯.৫	১১.০	১২.০	১১.৫
অন্যান্য দেশ	১.১	১.৪	১.৯	২.৪

ইত্যাদি থেকে উৎপাদন করছে ইথানল। ইথানল উৎপাদনে গতি হ্রাস করেছে খাদ্য শস্যের ব্যবহার কমিয়ে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন চাহিদার ৪৭ শতাংশ বায়োডিজেল উৎপাদন করতে পারছে। তার ৮০ শতাংশ, ৪.৭ মিলিয়ন লিটার রেপসিড থেকে, বাকিটা পশুর চর্বি, রান্নায় ব্যবহৃত তেল থেকে। গম, ভুট্টা বার্লি, সুগার বিট থেকে ইথানল উৎপাদন করছে। আমেরিকা, চাহিদার ১৩ শতাংশ বায়োডিজেল উৎপাদন করছে সোয়াবিন থেকে। ব্রাজিলও বায়োডিজেল উৎপাদন করে সোয়াবিন, সূর্যমুখি, রেপসিড থেকে। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া উৎপাদন করে পামতেল থেকে। বায়োডিজেল ও ইথানল উৎপাদনে আগ্রহী করতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অনুদান দেয়। অনুদানের পরিমাণ ন্যূনতম লিটারে ০.২ ডলার থেকে এক ডলার। OECD দেশগুলি উৎপাদন ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই অনুদান দিয়ে থাকেন।

আমেরিকা পেট্রলের সঙ্গে ৩ শতাংশ মিশ্রণ নীতি নিয়েছে, ব্রাজিল ২৫ শতাংশ, চীন ও ইন্দোনেশিয়া ১০ শতাংশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৫.৭ শতাংশ। (সরণী -২)। ভিন্ন ভিন্ন তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে খাদ্যশস্য থেকে জৈবজ্বালানির বৃদ্ধি বছরে মাত্র ১.৪ শতাংশ। খাদ্যশস্য থেকে জৈবজ্বালানি উৎপাদনের জন্য এখনই খাদ্যশস্যের দাম ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবধান বাণী ২০২০ সালের মধ্যে তৈলবীজের দাম ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ভুট্টার বৃদ্ধি পাবে ২৬ শতাংশ। এভাবে চলতে থাকলে হয়ত খুব অল্পদিনের মধ্যেই গোটা বিশ্ব দেখবে এক নজিরবিহীন যুদ্ধ, কারণটা হবে খাদ্য শয্যের মূল্যবৃদ্ধি।

তথ্যসূত্র : D Chand, 2009
FAO, 2008
Nylor et al, 2007
Trostle, 2008
Rosegrand, 2008
Heady and Fan, 2010
Runge and Senauer, 2007, 2008
Qiu et al, 2010
International Food Policy Research Institute
National Bio fuel Policy, India.
Babcock, 2011
Von Barun, 2008

সারণী - ২
বায়োডিজেল ও ইথানল উৎপাদনের আংশিক চিত্র

ইথানল				বায়োডিজেল		
খাদ্যশস্য	উৎপাদনের লক্ষ্য মিলিয়ন লিটার	মিশ্রণ শতাংশে	রাষ্ট্র	খাদ্যশস্য	উৎপাদনের লক্ষ্য মিলিয়ন লিটারে	মিশ্রণ শতাংশে
ভুট্টা	৪৬০১৭	৩	আমেরিকা	সোয়াবিন	২৭০৭	১
আখ	২৮৯৫০	২৫	ব্রাজিল	সোয়াবিন রেডি	২১৬২	২
গম,ভুট্টা, বারলি, মিষ্টি বিট	৬৪৬৫	৫.৭৫	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	রেপসীড, সোয়াবিন সূর্যমুখী, পশুরচর্বি, ব্যবহারিত রান্নার তেল	৯৮৮০	৫.৭৫
গম, ভুট্টা	১৫৭২	৫	কানাডা	ভোজ্যতেল	৩৬০	২
গম, ভুট্টা, কাসাভা, মিষ্টি সারগম	২০৮৩	১০	চীন	পামতেল, জাত্রোফা	—	৫
আখের গুড়, মিষ্টি সারগম	১৫৫০	৫	ভারত	জাত্রোফা, করঞ্জ	৯৫	৫
আখ, কাসাভা	৪২৫	১০	ইন্দোনেসিয়া	পামতেল, জাত্রোফা	৩৪৮	১০
—	—	—	মালয়েশিয়া	পামতেল	৬৪৭	৫

দুই ঃ বায়ুবিদ্যুৎ বনাম পরমাণুবিদ্যুৎ

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের পারমাণবিক বিদ্যুৎ নয়। ভারতের বিদ্যুৎ চাহিদা মিটবে বায়ুবিদ্যুৎ থেকে। শুধু মিটবেই না উদবৃত্তই হবে। ভারতে বিকল্প শক্তির সম্ভাবনার খোঁজে, নতুন ও পুনর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে এক মৌ (Mou) চুক্তি হয়েছিল Lawrance Berkeley National Labrotory'র। অনুসন্ধানের প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ৮০ মিটার উচ্চতায় উইন্ডমিলগুলো বসালে উৎপাদন করা যাবে ২০০৬ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ। আর উইন্ডমিল গুলো ১২০ মিটার উচ্চতায় বসানো হ'লে উৎপাদন করা যাবে ৩১২১ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ। এধরনের উইন্ডফার্মের জন্য জমির প্রয়োজন ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার, তবে উইন্ডমিল ও অন্যান্য যন্ত্রংশের জন্য প্রয়োজন মাত্র ৩ শতাংশ জমি। অর্থাৎ ৩০০ বর্গ কিলোমিটার জমি, বাকি ৭,৭০০ বর্গ কিলোমিটার চাষ-আবাদ সহ যে কোন কাজেই ব্যবহার হতে পারে। তাপবিদ্যুৎ (কয়লা) উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমির প্রয়োজন হয় প্রতি মেগাওয়াটে ০.৭ একর। জ্বালানি কয়লাও দিতে হবে। ছাই বাতাসে-জলে মিশবে। পরিবেশে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস। কোন প্রকার জ্বালানি ছাড়াই বিদ্যুৎ দেবে উইন্ড মিল। পরিবেশ দুষনের গল্পও থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী দুঃখিত, মর্মাহত, কারণ তার প্রিয়জনের থেকে অচল পরমাণু চুল্লিগুলো ভারতের মাটিতে ঢুকতে গেলে বাধা দেবে বায়ুশক্তি ও জলশক্তি। পুরো তথ্যটাই দেখতে পারেন Reassessing Wind Potential Estimates for India : Economic and Policy Implications. http : llies. lbl.gov/mode/473.

তিন ঃ ডিভিসি'র খালের উপর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প

কেবলমাত্র সিঙ্গুর নন্দিগ্রামই নয়, গোটা দেশজুড়েই চলছে জমি অধিগ্রহণ। নামে অধিগ্রহণ বাস্তবে লুন্ঠন। জমি লুন্ঠনকে দেশের প্রয়োজনে বোঝাতেই রাজনীতিবিদরা বলেছিলেন "শিল্পতো আকাশে হবে না।" লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস প্রশাসনের। সঙ্গে হার্মাদদের খুন, ধর্ষণ, লাসলোপাট, আমজনতাকে বাধ্য করেছিল লুন্ঠনটা মেনে নিতে। তবে ব্যালটে জবাব দিয়েছিল। পরিবর্তন হল সরকারের। নতুন সরকারের নীতি,-জমি অধিগ্রহণ ওরফে লুন্ঠন করবো না। প্রয়োজনে জমি কিনেই হবে শিল্প। কিনবে শিল্পদ্যোগী নিজেই, জমি মালিকের থেকে। কৃষিজমি ধ্বংস না করে শিল্প সম্ভব সেটা আজ তুলে ধরেছে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন ওরফে ডিভিসি। ২০০০ মেগাওয়াটের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা। জমি দখল করে নয়। মহাকাশেও নয়। হবে তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকা ২৫০০ কিলোমিটার খালের ওপর। এতে খালের জলও কম বাষ্পায়িত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিক্ষামূলক ১৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প হবে খালের ওপরই। দুষণমুক্ত সৌর বিদ্যুৎ। পরিবেশে কার্বনডাই অক্সাইড ছড়িয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ণ বাড়ারে না। কার্বন ক্রেডিট পাওয়া যাবে। এটা বিশ্ববাজারের পণ্য, কেনাবেচা হয়। বিক্রি করে পাওয়া যাবে কিছু বিদেশী মুদ্রা। তাপবিদ্যুৎ হলে জ্বালানিও লাগত। দুষণও হত। প্রয়োজন হত ১৪০০ একর জমি। ঐ অঞ্চলে বছরে ২৩০০ থেকে ২৪০০ ঘন্টা সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। পাওয়া যাবে কমবেশি ৪৭০০ গিগাওয়াট আওয়ার সৌর বিদ্যুৎ (GWH)। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৃষ্টি হবে বেশ কিছু কর্মদিবস। সবটাই ২৫০০ কিমি জুড়ে বসবাসকারী মানুষদের জন্য। ওয়েবরেডার প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গণ চৌধুরী মহাশয়ের মতে "জলের ওপর এ ধরনের প্রকল্প করলে খরচ অনেকটাই বাড়বে। বর্তমানে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের খরচ প্রতি মেগাওয়াটে ৮(আট) কোটি টাকা আর বাজারে সৌর বিদ্যুৎ মাশুল ৯(নয়) টাকা ইউনিট। মরচে ধরার হাত থেকে প্রকল্পটা রক্ষা করতেও খরচ অনেকটাই বেশি হবে।" খরচ বেশি হবে, একথা তাঁর মত অভিজ্ঞ মানুষ কি করে বলছেন, বোঝা যাচ্ছে না। যে কোন শিল্প প্রকল্পের মধ্যে জমির একটা দাম ধরা হয়। এই প্রকল্পে তো জমি ক্রয় করতে হবে না। প্রশ্ন নেই জমির দামের। তাতেও খরচ বেশি হবে কি করে? তাঁর তো বলা উচিত ছিল কৃষি বা অকৃষি জমি দখল না করেই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প করা যাচ্ছে, সেটাইতো বড় কথা। মনে হচ্ছে গণচৌধুরী মহাশয় পরিবেশ ও জমির মূল্য বোঝেন না। তিনি আরও বলছেন মরচে পড়ার হাত থেকে প্রকল্পটা রক্ষা করতে খরচ বাড়বে। তিনি তো সৌরবিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ, তাঁর তত্ত্বাবধানেই তো সুন্দরবন খাড়ি অঞ্চলে বসেছে ছোট বড় অনেক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প। তিনি তো অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন এই সৌর বিদ্যুতের জন্য। তিনি কি জানেন না ক্যাথোডিক প্রোটেকটরের নাম? যৎসামান্য খরচ করলে বহুযুগ ধরেই লোহার কাঠামো মরচের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। মানুষ আপনাকেও না জমির হাঙর ভেবে বসে!

জিএম খাদ্যের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্ক জীববিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গব

অবনী ভট্টাচার্য

গত ৩০শে অগাস্ট, ২০১২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে ফোরাম এগেইন্‌স্ট মোনোপলিস্টিক অ্যাগ্রেশন বা ফামা (FAMA) একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল। তাতে প্রবীণ জীববিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গব তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। ভার্গব তাঁর ভাষণে ভারতে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা জি. এম. খাদ্যশস্য চাষের তীব্র বিরোধিতা ক'রে মানবশরীরে জি. এম. ফুডের সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাবের আশঙ্কা তুলে ধরেন।

ভার্গব বলেন, জি. এম. খাদ্যশস্য ব্যবহারের বিপক্ষে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো হতে শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন, সুপরিচিত বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় এক হাজার গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের স্বাস্থ্যের ওপর, পরিবেশের ওপর এবং মাটির উর্বরতার ওপর জি. এম. খাদ্যশস্যের ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। ভার্গব মন্তব্য করেন, কানাডায় এমন অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে যা ইঙ্গিত দেয় ("suggest, if not prove") যে, জি. এম. ফুড খাওয়ার ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে।

এসবই জি. এম. শস্য ব্যবহারের স্বল্পমেয়াদী ক্ষতিকারক প্রভাব। কিন্তু এছাড়াও জি. এম. ফুড খাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির আশঙ্কা যে কতটা বাস্তব (concrete) এবং গুরুত্বপূর্ণ, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন প্রবীন বিজ্ঞানী হিসেবে ভার্গব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কোনো জি. এম. খাদ্যশস্য ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকারক প্রভাবের আশঙ্কা খতিয়ে দেখার জন্যে প্রয়ে তিরিশটি পরীক্ষা (tests) করা দরকার। কিন্তু কেউই তা করেনা। কেননা, ওসব করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। কোনো একটা খাদ্যশস্য নিয়ে ওসব পরীক্ষা করতেই প্রায় কুড়ি বছর লেগে যাবে। অর্থাৎ ভার্গবের বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, জি. এম. খাদ্যশস্য ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভার্গব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির নিরূপণের জন্যে দরকারি তিরিশটি পরীক্ষা না ক'রে কোনো জি . এম. খাদ্যশস্যই বাজারে ছাড়পত্র পেতে পারে না।

ভার্গব বলেন, জি. এম. বীজের প্রধান ব্যবসায়ী হোলো বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো। তিনি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে মনসান্টোকে "সবচেয়ে বিবেকহীন ও নীতিজ্ঞানবর্জিত" ব'লে বর্ণনা ক'রে মনসান্টোর অসাধুতা ও মিথ্যাবাদিতার কিছু উদাহরণ দাখিল করেন। এইসব বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সরকারের (দলমত নির্বিশেষে) যে সহযোগিতামূলক নিবিড় সম্পর্কের কথা আমরা জানি, ভার্গবও সেটা আবার আমাদের মনে করিয়ে দিলেন।

ভার্গবের পুরো বক্তৃতাটি বাংলায় অনুবাদ ক'রে (অনুবাদক প্রতুল মুখোপাধ্যায়) ফামা ২০১৩-র বইমেলায় একটি পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করছে। উৎসাহী পাঠকেরা তা পড়ে দেখতে পারেন।

ভারতে জি. এম. খাদদ্যশস্য চাষের বিরুদ্ধে প্রবীণ ভারতীয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র পুষ্প ভার্গবই সোচ্চার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জি. এম. ফুড নিয়ে ওনার লেখাগুলো কোনো ওয়েবসাইটেই একজায়গায় পাওয়া যায় না। ফামা-র কর্মীরা যদি একটা ওয়েবসাইট তৈরি ক'রে তাতে জি. এম. ফুড সম্পর্কে ভার্গবের সমস্ত লেখা প্রকাশ ক'রে আমাদের পড়ার সুযোগ ক'রে দেন, তবে তা ভারতে জি. এম. ফুড নিয়ে বিতর্কে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে প্রেরণা যোগাবে।

রাইস মিল থেকে জল ও বাতাস দূষণ

সুজিত দাস ও রবীন ব্যানার্জি

ভেতো বাঙালী আমরা। পেটপুরে ভাত খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। কিন্তু কজনই বা জানি কত ধানে কত জল দূষিত হয়। কী বিরাট সমস্যা সেই দূষণ সামলানোয়?

ধান থেকে চাল উৎপাদনের সব ধরনের সনাতন পদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে উঠে এসেছে আধুনিক মিল গুলো। ধানকে পরিষ্কার করা, আংশিক সেদ্ধ করা, শুকনো করা এবং ধানের থেকে চাল বের করা সবই করে এ মিল। পুরোটাই প্রায় অটোমেটেড। বাষ্প শক্তি জোগায়। জ্বালানি রাইস হাস্ক বা তুষ ধানের থেকেই পাওয়া যায়। কমবেশি ৪০ শতাংশ। একই সাথে বার করে নিচ্ছে তেলটাও (রাইস ব্রান অয়েল), যা সনাতন পদ্ধতিতে সম্ভব ছিল না। এতগুলো কাজ করার জন্য আছে মাত্র গুটিকতক শ্রমিক। চলে ২৪ ঘন্টা, উৎপাদন হয় ১৫০ থেকে ২৫০ টন চাল। বছরে ২০০দিন।

ধানকে বাষ্প দিয়েই আংশিক সেদ্ধ করা হয়, সেই অবস্থায় ধান নিজ ওজনের ১৮ থেকে ২২ শতাংশ জল ধরে রাখে। ফলে স্টার্চটা নরম আঠালো হয়ে যায়। ধানের মধ্যে জমা হওয়া কীটনাশকের অবশেষ যেটুকু থাকে তার অনেকটাই বাষ্পের সাথে বেরিয়ে যায়; ধানের গায়ে লেগে থাকা ধুলো বালি, কাদা, মাটি যাই লেগে থাকুকনা কেন বাষ্পের চাপে তা ধুয়ে মুছে যায় ধান থেকে। ভেসে বেড়ায় বাষ্পের মধ্যে। একই সঙ্গে কিছুটা স্টার্চ, খনিজ লবণ, ভিটামিনও বার হয়ে যায় ধানের থেকে বাষ্পের সঙ্গে। সেদ্ধ ধান শুকনো করার জন্যও বাষ্প দরকার। বাষ্পকে জলে পরিণত করেই সৃষ্টি হয় বায়ুশূন্য পরিবেশ, ধানকে শুকনো করতে ব্যবহার করা হয় সেই বায়ু শূন্য পরিবেশটা। এতগুলো কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় বাষ্পের, বাষ্পের জন্য জলের। প্রতি টনে ৭০০ থেকে ৮০০ লিটার। দৈনিক ১৬০ টন উৎপাদন ক্ষমতার রাইমিলের প্রয়োজন হয় দৈনিক ২৭০ কিউবিক মিটার জল। সম পরিমান জল বর্জ্য হয়ে বেরিয়ে আসে রাইস মিল থেকে। সঙ্গে যুক্ত হয় ধুলো, ময়লা, কাদা, স্টার্চ, খনিজ লবন, ভিটামিন। সবাই মিলে মিশে তৈরি হয় আর এক পদার্থ, মিশে থাকে বর্জ্য জলের সঙ্গে। ভরিয়ে তোলে খানা, খন্দ, নালা, জমি, পচিয়ে দেয় বর্জ্য জলকেও। দুর্গন্ধে ভরে ওঠে এলাকা; জল ও বায়ু দূষণ হয়ে, পরিবেশ বিষময় করে তোলে।

গোটা বর্ধমান জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ২৪৮টি আধুনিক রাইস মিল। গড়ে ২০০ কিউবিক মিটার জল প্রতিদিন প্রতিটি মিলের প্রয়োজন। দৈনিক ৪৯,৬০০ কিউবিক মিটার জল। বছরে ৯৯.২ লক্ষ কিউবিক মিটার। এত পরিমাণ জল উত্তোলন হচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে। এটাও চিন্তার বিষয়। ধান উৎপাদনের চেয়েও ধান থেকে চাল উৎপাদনে জলের প্রয়োজনটা বেশি হচ্ছে। আর ভুগর্ভস্থ জলটা শুধু ধান ও চাল উৎপাদনের জন্য নয়। শিল্প, গৃহস্থালি ও অন্যান্য চাষ আবাদেও তো জলের প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বললেও কোথাও 'জল ধরো জল ভরো' চালু নেই। সবার জন্য জল সরবরাহ করতে সেই ভূগর্ভস্থ জলাধার। সেই জলাধার আর কত দেবে? রাইস মিলের বর্জ্য জলকে দূষণ মুক্ত করে, বারবার ব্যবহার করলে এত জল উত্তোলনের প্রয়োজন হবেনা। এ ভাবনা নিয়ে অনেক মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবেই গবেষণা করছেন, পেয়েছেনও অনেক তথ্য। কিন্তু সমাধান এখনও দূর-অস্ত।

পেঁপে পাতার নির্যাস ডেঙ্গুরোগীদের এক আশ্চর্য ওষুধ?

সেঁজুতি মণ্ডল

গবেষক, রসায়ন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[বর্তমানে ডেঙ্গু একটি ভীতিপ্রদ প্রাণঘাতী রোগ এবং মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতদের সংখ্যা। এক ভয়াবহ জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে ।
শ্রীলঙ্কার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ সনৎ হেটিগের মতে, পেঁপে পাতার নির্যাসের প্রভাব ডেঙ্গুরোগীদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ডেঙ্গুরোগীদের আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বা হেমারজিক অবস্থা থেকে রক্ষা করে। আরও গভীর গবেষণার উপযুক্ত একটি ক্ষেত্র হতে পারে বিষয়টি—স: ম:]

ডাঃ হেটিগ ডেঙ্গুরোগীদের ওপর কার্সিয়া পেঁপে পাতার নির্যাসের প্রভাব জানার জন্য একটি পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষার ফলাফলটি 'শ্রীলঙ্কা ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান' পত্রিকায় ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এতে দাবী করা হয় যে, নির্যাসটি আক্রান্তদের শ্বেত কণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং হাসপাতালের সাহায্য ছাড়াই আরোগ্যলাভ সম্ভব হয়। জুন ২০০৯ এ প্রকাশিত আই এম পি. এ (IMPA) পত্রিকাতেও (বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৬) ডাঃ হেটিগের পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

ডাঃ হেটিগের সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় 'র‍্যান্ডমাইজড্ কন্ট্রোলড্ ক্লিনিকাল ট্রায়াল' (Randomised controlled Clinical Trial) যা মোট ৭০ জন ডেঙ্গু রোগীর উপর করা হয়েছে। এদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। এই গবেষণা থেকে জানা গেছে, যে সমস্ত রোগী পেঁপে পাতার নির্যাস পান করেছেন তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি না হয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। যে সব রোগীদের এই নির্যাস দেওয়া হয়নি তাদের তুলনায় এই রোগীদের আরোগ্যলাভ হয়েছে সহজ ও দ্রুত।

ডাঃ হেটিগ উক্ত নির্যাসটি ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছেন এবং পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন সংখ্যাও (Patent member) পেয়েছেন। এখন চূড়ান্ত স্বীকৃতির অপেক্ষায়।

ডাঃ হেটিগ জানিয়েছেন, যে কোন ফলন্ত পেঁপে গাছ থেকে পাতা নিয়ে (রেড লেডি পেঁপের প্রজাতিটি এক্ষেত্রে বেশি কার্যকর) ভাল করে জলে ধুয়ে কাঠের খলনুড়িতে জল এবং কোন লবণ ছাড়া ভালো করে থেঁতো করে নিতে হবে। এরপর থেঁতো করা পাতাগুলিকে নিংড়ে নির্যাসটি বার করে জল, চিনি বা নুন না মিশিয়ে খেতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১০ মিলিলিটার নির্যাস দিনে ২বার করে এবং শিশুদের (৫-১২ বছর) ৫ মিলিলিটার দিনে ২ বার করে খেতে হবে।

ডাঃ হেটিগের মতে, পেঁপে পাতার নির্যাস তিনটি প্রধান কার্য সম্পাদন করে—প্রথমত, এটি শ্বেতরক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও রক্তের তঞ্চনক্ষমতাকে স্বাভাবিক করে, যা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, এটি ক্ষতিগ্রস্ত লিভারের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তৃতীয়ত, আক্রান্ত লিভারের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে এটি সারাতে সাহায্য করে।

হেমোরজিক ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম অবস্থায় এটি গ্রহণ করলে সব থেকে ভালো হয়। সে ক্ষেত্রে অনুচক্রিকার সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিলিটারে ১৫০০০০ থেকে হ্রাস পায় এবং প্যাকড্ সেল ভল্যুম (Packed Cell Volume) ১০ শতাংশ বেড়ে যায় যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন /WHO) কর্তৃক বিবেচ্য লক্ষণগুলি হল প্রতি ঘনমিলিলিটারে ১০০০০০ এর নীচে অনুচক্রিকা এবং প্যাকড সেল ভল্যুমের ২০ শতাংশ বৃদ্ধি।

যে সমস্ত ডেঙ্গুরোগীর অণুচক্রিকার সংখ্যা এবং রক্ততঞ্চনের ক্ষমতা অত্যন্ত কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও নির্যাসটির অবশ্যই উপকারী প্রভাব রয়েছে কিন্তু ডেঙ্গুর অন্তিম অবস্থায় যখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী অঙ্গগুলি

বিকল হতে শুরু করে তখন এই উপকারী প্রভাবের মাত্রাও হ্রাস পায়। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে পেঁপে পাতার নির্যাসটিও গ্রহণ করলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন ডাঃ হেটিগ।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত (২৮ অক্টো'১২) আর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেল— পেঁপে পাতার নির্যাস বা রস থ্রম্বোসাইট নামক অনুচক্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকরী। এডিস মশাবাহিত জেঙ্গুজ্বরের সাধারণ লক্ষণগুলি হল—দেহের উচ্চ তাপমাত্রা, মাথাব্যথা, পেশীর অত্যন্ত যন্ত্রণা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা এবং ত্বকের ওপর লাল দাগযুক্ত ফুসকুড়ি। ডেঙ্গুর কিন্তু কোন তথাকথিত ওষুধ নেই। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডেঙ্গুজ্বরের নিয়ন্ত্রণে ও প্রতিকারে পেঁপে পাতার নির্যাস অত্যন্ত উপযোগী। 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট' কর্তৃক পাঁচ ডেঙ্গুরোগীর উপর করা সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া গেছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ—পেঁপে পাতার নির্যাস পান করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওই পাঁচ ডেঙ্গুরোগীর অনুচক্রিকার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং তাদের স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থারও উন্নতি হতে থাকে। অতএব বলা যায়, এই তিক্ত সবুজ বর্ণের নির্যাসটি মানবদেহে কোন ক্ষতি না করে ডেঙ্গু নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেয়। কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল ও নিউট্রাসিউটিক্যাল কোম্পানী এরই মধ্যে পেঁপে পাতার নির্যাসটি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পেঁপে পাতার নির্যাসটি ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হতেও দেখা যায়। ২০১০ সালে প্রকাশিত 'জার্নাল অফ এথনোফার্মাকোলজি'র একটি গবেষণাপত্র অনুযায়ী আমেরিকা ও জাপানের চিকিৎসক এবং গবেষকগণ এই পাতার নির্যাসে এমন একটি উৎসেচকের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন যেটির মধ্যে ক্যান্সার প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে। এবং এটি জরায়ু, স্তন, ফুসফুস ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের ঔষধ হিসাবে কাজ করে। সমীক্ষাটি থেকে আরও জানা যায় পেঁপে পাতার কোন বিষক্রিয়া নেই এবং এটি সম্পূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন। তাই বর্তমানে চিকিৎসকেরা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের কেমোথেরাপির অঙ্গ হিসাবে পেঁপে পাতা থেকে তৈরী চা পানের পরামর্শ দেন। আমেরিকার পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের (Purdue University of United States) এ গবেষণায় জানা যায় যে, পেঁপে পাতায় রয়েছে ৫০টিরও বেশি সক্রিয় উপাদান যেগুলি ছত্রাক, কীট, বহুবিধ পরজীবী, ব্যাকটিরিয়া ও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে। এতে উপস্থিত ভিটামিন A, C, এবং E এর মতো আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ডেঙ্গুরোগীদের চিকিৎসার জন্য বলা হয়, গাছ থেকে সদ্য ছিন্ন দুটি পত্র বেঁটে নিয়ে দুই টেবিলচামচপূর্ণ নির্যাস প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর দিনে অন্তত তিনবার পান করতে; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, এটির ব্যবহার কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শের বিকল্প নয়।

তথ্যসূত্র :

সি. আই. মুনাসিংহে লিখিত 'প্যাপাইয়া লিফ এক্সট্র্যাক্ট—ওয়ান্ডার ড্রাগ ফর ডেঙ্গু পেশেন্টস' (সান্‌ডে অবজারভার ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১০) এবং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮ অক্টোবর, ২০১২

কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

মহেশ রাজ সিংভির (Mahesh Raj Singhwi <fauna.mr@gmail.com> সৌজন্যে রিপোর্টগুলি প্রাপ্ত।

সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান সাময়িকী

কালধ্বনি

যোগাযোগ ঃ ২/১এ আশুতোষ শীললেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ই-মেল ঃ kalodhvani@yahoo.co.in, M : 9830227186

আকাশবিহারী চাঁদের বারি

নিখিলেশ পাল

" মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া....." — রবীন্দ্রনাথ

"— ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে....." গায়ক যাই ভেবে থাকুক - অ্যারিস্টটলের ধারণায় "মার্বেল পাথরের মতো পালিশ করা চাঁদের চকচকে গা" কি অমিত সূর্যলোককে শায়েস্তা করতে পারে! তবে কী কবি-শিল্পীদের মনোহরণের জন্য স্তিমিত করেছে প্রতিফলিত সূর্যের তেজরশ্মিকে, ".....বিশদ জ্যোৎস্না কুসুম কোমল, ... সকলই আমার মতো।" চাঁদ তার জলীয় সত্ত্বাকে লুকিয়ে রেখেছিল মেরু অঞ্চলের গভীর গহন গহ্বরের (Craters) তলদেশে। আগাম ঈঙ্গিত ছিল কবি-র মনে তা না হলে কাব্যরসে সে ভিজবে কেন ? জ্যোতিবিজ্ঞানীদের থেকে দু-কদম এগিয়ে ছিল কবিরা-ই। পার্থিব শ্যামলিমায়, নদী সমুদ্রে সন্তুষ্ট না হয়ে কাব্যে, প্রেমে, সঙ্গীতে চাঁদকে সঙ্গিনী না করে কবেই বা মানুষ চলেছে! চন্দ্রাহত হবার ঘটনাও পৃথিবীময়। পার্টিকেল - অ্যান্টিপার্টিকেল সমন্বয় না হলে বিশ্বের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনই চন্দ্রালোকে চন্দ্রাহত না হলে প্রেমের-ই ইন্টিগ্রিটি, ডেমোক্রেসি কোথায়। মিলন বিচ্ছেদে'র ডুয়ালিটি না হাইজেনবার্গের আনসার্টেন্টি!

চন্দ্রবিজয়ের ৪০ বছর পরেও হাল ছাড়েনি লুনার ভূতত্ত্ববিদ্‌রা। চাঁদে জল থাকবেই। নইলে চাঁদের জাত যায়। প্রাণ নেই বলে কি পানীয় থাকবে না! প্রকৃতির রহস্যভেদ করার চেষ্টায় তাই কাব্যের গন্ডি পেরিয়ে উত্তীর্ন হোল নাসা থেকে ইসরো।

"ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছে দূর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম
নিকটে আসিনু ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
আজানা প্রবাসে যেন চির জানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয় গৃহখানি" — (স্ফুলিঙ্গ)

"চিরজানা বাণী" অজানার আবরণ টেনে রেখেছে তার চারধারে। এই আবরণ খোলামাত্র যাকে চিনব, তার সঙ্গে আমাদের চিরদিনের চেনা। বিজ্ঞান উন্মোচন করল সেই আবরণ, ধরা দিল সেই চির-চেনা।

চাঁদের উভয় মেরুর অর্থাৎ উপরের অক্ষাংশের (হায়ার ল্যাটিচিউডস্) গহ্বরগুলোর মেঝেতে যেখানে কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি সেই চির-ছায়াবৃত অঞ্চলে পাওয়া গেল তুষার কণা বা ফ্রস্ট। বারংবার সূর্য পরিক্রমায় 'প্রখর তপন তাপে' ও সূর্যের বিকিরণ চাপে যে সব ধূমকেতুদের বাইরের খোলস উবে যায়, ঝরে পড়ে, সেই 'বেগের আবেগ' হারানো অবশিষ্ট বরফের গোলাকার নিউক্লিয়াসটি কখনো কেমন এক বিরল সম্ভাবনায় (পরিত্যক্ত ধূমকেতুটির গতিপথের অবস্থানের জ্যামিতি নির্ধারিত ও চাঁদের দূর্বল অভিকর্ষেরও শিকার) সংঘাতে পতিত হয় চন্দ্রপৃষ্ঠে। যেটুকু পড়ল চির অন্ধকার ছায়াশীতল গহ্বরগুলোর গর্ভে;-চল্লিশ ডিগ্রি কেলভিন (মাইনাস ২৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)তাপমাত্রার চরম শীতলতায় - আরো জমাট বেঁধে পড়ে রইল যুগ যুগ ধরে। অন্য মতে- সৌর-ঝড়ে তাড়িত প্রোটন কণারা (যা আসলে হাইড্রোজেন পরমানুরই নিউক্লিয়াস) চন্দ্রগাত্রের শিলা ও আকরিকে নিহিত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় তৈরী করেছে মুক্ত জলের অণু। সাম্প্রতিককালে চন্দ্রকক্ষপথে পাঠানো উপগ্রহগুলো (অরবাইটার) এইসব ছায়াশীতল ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে জলের অনুর নিহিত হাইড্রোজেনের প্রাবল্য লক্ষ্য করেছে। তবে হিমাঙ্কের এতটা নীচের তাপমাত্রায় এগুলো জমাট বাঁধা অ্যামোনিয়া (এন এইচ-৩) বা মিথেন বরফের (সি এইচ-৪) সংশ্লিষ্ট হাইড্রোজেনও হতে পারে বলে কারো কারো সন্দেহ। ২০০৯ সালে ৯ই অক্টোবর এল-ক্রস (L CROSS) নামকরণ করা একটি ভারী বস্তুকে নাসা আছড়ে ফেলে ওই অঞ্চলে।

এই কৃত্রিম বিস্ফোরণে ময়ূরের পেখম মেলার মত ফুটে ওঠা বিপুল ধূলিকণার অবলোহিত তরঙ্গের বর্ণালী বিশ্লেষণে জলীয় বাষ্পের স্বাক্ষর ধরা পড়ে।

তার ঠিক তিন সপ্তাহ আগে ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযানের চন্দ্রায়ন-১ উপগ্রহটির পেটে বসানো মুন মিনারেলজি ম্যাপার (ইসরোকে নাসার দেওয়া উপহার) চাদের মেরু অঞ্চলের কাছেই জলীয় বাষ্প ও হাইড্রক্সিল মুলক-এর সন্ধান দেয়;চাঁদের সর্বাধিক রৌদ্রদগ্ধ পিঠটা যে চরম শুষ্ক অনেক বছরের পুরানো এই বিশ্বাসটাকে নস্যাৎ করে। এই অঞ্চলটায় সর্ব্বোচ্চস্তরের (টপসয়েল) কয়েক মিলিমিটার পুরু ধূলোর আস্তরণের মধ্যে মাত্র ১ বা ২ অণু পরিমাপের পুরু (প্রাকৃতিক ন্যানো প্রযুক্তি নাকি!) জলের অণুরা স্টিকারের মতো আটকে থাকে। অর্থাৎ ঐ দুই মিলিমিটার বেধের আস্তরণটার টনখানেক ধূলো ঝাঁট দিলে এক লিটার পরিমান জল পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মরুভূমির থেকেও চাঁদের মাটি অনেক বেশি 'শুখা'। তবুও মানবজাতির কাছে তা এক সম্ভাবনাসূচক বহুমূল্য 'জলীয় সম্পদ'। জনবিস্ফোরণে ক্লিষ্ট ভাবী প্রবাসী পৃথিবীবাসীর কাছে বহুমূল্য। ভাবী প্রবাসী পৃথিবীবাসীর কাছে চন্দ্রপৃষ্ঠে আস্তানাগড়ার একটা ক্ষীণ প্রতিশ্রুতি তো চাঁদ-মামার থাকলো! চিন-বাংলাদেশ ভারতসহ পশ্চিম এশিয়া তথা তৃতীয় বিশ্ববাসীর কাছে সংবাদটা সুখের হতে পারে।

"এস শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ - (ইউ এস এ) জানুয়ারী ২০১০

২. বিজ্ঞানমনস্ক রবীন্দ্রনাথ - সঙ্কর্ষণ রায়।

With Best Compliments From :

AIMBE

36/1/1 Tangra Road, Kolkata 700 015
Contact No. : 9330446711(2.p.m. to 8 p.m.)

Service for

● Pest control ● Dusting & Cleaning ● Book Preservation
● White Ant Treatment
● Termite Control
● General Order Supply

References :

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office, etc.)
Colleges (Libraries & Laboratories)
Banks
Central & State Government Offices

এক ঃ আবার দোহা আবার ভূ-উষ্ণায়ন

ভূ-উষ্ণায়ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার যে পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাপী সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্কিন মুরুব্বিদের সেই সহমত প্রথম থেকেই না পসন্দ! তারা কিয়োটো বিধি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে আর গলার শির ফুলিয়ে বলছে, ঠিক সুকুমার রায়-এর পাগলা দাসু-র স্টাইল-এ, চীন আর ভারত কেন কিয়োটো বিধিতে বাড়্তি সুবিধে পাচ্ছে! সুকুমার রায় বলেছিলেন যে 'দাসু পাগল বলিয়া তাহার শাস্তি হইলো না'। আর আমরা সেই বাক্যটার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বলতে পারি, "মার্কিন অত্যাচারে দুনিয়ার দাসু-বৃন্দ পাগল হইয়া শাস্তি ভোগ করিলো!"

ভূ-উষ্ণায়ণ রোধ এবং কিয়োটো বিধি রূপায়ণে নজরদারির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ এই বিধিতে সহমত পোষণকারী দেশগুলোর মধ্যে নিয়মিত সভা-সম্মেলনের জন্য কনফারেন্স অফ পার্টিস বা 'কপ' গঠন করেছে। এই 'কপ' দফায় দফায় পৃথিবীর শহরগুলোতে নিয়মিতভাবে মিলিত হয়। এর আগে কানকুন, দোহা এবং কোপেনহেগেন -এ বৈঠক বসে। মার্কিন দেশ বিপদ আঁচ করে এই সব সম্মেলনে মন্ত্রীস্তরের কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে না পাঠিয়ে ছোটো-খাটো পাতি আমলাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করে। স্বভাবতই তারা কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তে সম্মতি বা অসম্মতি দেওয়ার আধিকারি না হওয়ায় সমগ্র আলোচনাগুলি প্রহসনে পর্যবসিত হয় এবং তা প্রত্যাশিত অশ্বডিম্ব প্রসব করে। পরবর্তী কালে অন্যান্য দেশও এই একই খেলায় মাতে। বস্তুত বর্তমান দোহা পর্বের আলোচনা নিয়ে তাই সংবাদমাধ্যমে তেমন উদ্দীপনা চোখে পড়েনি। এই পর্বের আলোচনায় সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে অতঃপর ভূ-উষ্ণায়ণ এবং কার্বন নির্গমন-এর মতো এলেবেলে বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং 'আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' (যেমন ধরুন ব্যবসা-বাণিজ্য-মুনাফার ভাগ বন্টন, পরিবেশ ধ্বংসের কারণে অধিকার ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে। ২০১৫তে প্যারিসে পরবর্তী আলোচনা পর্ব পর্যন্ত এই চলবে! অবশ্য কিয়োটো বিধি-র মেয়াদ আরও প্রায় দশ বছর বাড়ানোর বিষয়ের মতো নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

কিয়োটো বিধির বর্তমান রূপ আসলে কার্বন বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক আইনী স্বীকৃতি। তাই কিয়োটো বিধি চালু না থাকলে বিশ্বের কার্বন ব্যবসার মুনাফায় ফুলতে থাকা দেশ এবং তাদের ব্যাঙ্ক গুলো মুখ থুবড়ে পড়বে। যে ইউরোপিয় ইউনিয়ন কিয়োটো বিধি চালু করার বিষয়ে মার্কিন দেশকে (সঠিকভাবেই) অহরহ গঞ্জনা বর্ষণ করে, তারাই আবার কিয়োটো বিধি মারফৎ এক সুগঠিত কার্বন ব্যবসা ফেঁদে বসেছে যার এক জবরদস্ত নাম হলো ইউরোপিয়ান এমিশনস্ ট্রেডিং স্কিম। লক্ষ্য করুন এখানে আছে ট্রেডিং, অর্থাৎ মুনাফা, পরিবেশ বাঁচানোর কথা নেই। তবে কিনা বলে পরিবেশও উপস্থিত, তবে তা রক্ষার বদলে ধ্বংসের উল্লাসে। ঠিক সেই সুকান্ত-র কবিতার মতো, যেখানে বেচারি মোরগ বড়লোকের খাবার টেবিলে সরাসরি হাজির হলো, খাবার খেতে নয়, খাবার হিসেবে!

তাই বর্তমান দোহা পর্বে আলোচনার মূল মঞ্চে পরিবেশ এবং আবহাওয়া বিজ্ঞানী সহ পরিবেশ কর্মীরা পাত্তা না পেলেও কার্বন ব্যবসার শেয়ার কেনা-বেচার দালালবৃন্দ, ব্যাঙ্কার, শক্তি উৎপাদক সংস্থা, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানার মালিকরা মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন। যে বিতর্ক হওয়ার কথা ছিলো-কোন দেশ কতটা কার্বন নির্গমন কমালো, কী ভাবে অতিরিক্ত বরফ গলার সমস্যা, জলতল বৃদ্ধির সংকট মোকাবেলা করা যাবে তা কার্যত পরিণত হলো ব্যাঙ্কার ও আর্থিক লগ্নীকারী সংস্থাগুলোর বোর্ড মিটিং-এ। আলোচনা হলো কেমন ভাবে রাষ্ট্র পুঞ্জের পরিবেশ বাঁচানোর তহবিল থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে কার্বন ব্যবসায় লগ্নি করা যায়, কেমন ভাবে পরিবেশ বাঁচানোর যন্ত্রপাতির নামে আরও কার্বন-ঘন অর্থনীতির কি পা বাড়ানো যায়, এই সব "আশপাশের বিষয়" নিয়ে।

দ্বিতীয় দোহা পর্ব দ্বিতীয় বার আন্তর্জাতিক আঙিনায় আপাতত পরিবেশ কর্মীদের পরাস্ত করে মুনাফার জয়গান গাইলো। তবে কিনা ঝানু ওস্তাদকেও এক সময় কালোয়াতি তান সম্পূর্ণ করে গানকে সমাপ্ত করতে হয়।

দুই ঃ কীটনাশক না প্রাণনাশক?

কীটনাশক মানবজাতির ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হত্যার ধ্বংসলীলা সেই ঐতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিষ বাষ্প মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়—ব্যবসায়ীবৃন্দ বুঝতে পারে যে মানুষকে বাঁচানোর জন্য লগ্নী করার চেয়ে মানুষকে মারার জন্য লগ্নী করা বেশি মুনাফা দেয়। ইউরোপের সাহেবরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্লোরিন গ্যাস সহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসে ব্যতিব্যস্ত হয়ে জেনেভা বিধি প্রণয়ন করলে মানুষ মারার ব্যবসা একটু ধাক্কা খায়। ইতিমধ্যে জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতা দখল করে ইহুদি-নিধন যজ্ঞের সূচনা করে। বিষ বাষ্প-র উৎপাদক কম্পানিগুলো মহা উৎসাহে নতুন করে বিষ বাষ্প উৎপাদন চালু করে। বুশ পরিবারের ঠাকুরদা প্রেসকট বুশ মহা উৎসাহে বেলজিয়ান ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে বিষ বাষ্প উৎপাদনে লগ্নী করে এবং সরাসরি হিটলারের গ্যাস চেম্বারে বিষ বাষ্প সরবরাহ শুরু করে।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সুড়ঙ্গে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উকুনের প্রাদুর্ভাব হয়। উকুন মারার তাগিদে বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক উৎপাদন শুরু হয়। জার্মানি সহ ইউরোপের অনেক দেশ যুদ্ধের জন্য নানা বিষাক্ত রাসায়নিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণে। হিরোসিমা-নাগাসাকির পর এক সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষ হয়।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলো পুনর্গঠনের সময় হঠাৎ আবিষ্কার করে যে বিষাক্ত রাসায়নিক অতি উৎপাদনের যে বাড়তি ক্ষমতা তারা যুদ্ধের বছর গুলোতে নির্মাণ করেছে, তা এখন চালানো তাদের দায়। যুদ্ধ ব্যবসায় সুনিপুণ মৃত্যুর কারবারিরা, রসায়নবিদ্‌দের সহায়তায় বুঝতে পারে যে, যে বিষ মানুষ মারতে সক্ষম, তা অন্যান্য প্রাণী হত্যাতেও সক্ষম। যা প্রয়োজন তা হলো অন্যান্য প্রাণীদের জন্য মারণ পরিমাণের নির্দ্ধারণ। জন্ম হয় রাসায়নিক কীটনাশকের।

যুদ্ধ বজায় রাখার যে আগ্রাসী দর্শন করপোরেশনগুলোর মুনাফার মূল উৎস, তারা এখন যুদ্ধের বর্শামুখ জাতি-রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমগ্র জীবজগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তারা খেত খামারের কীট, জলের পোকা, উড়ন্ত পতঙ্গ, সমস্ত কিছুকে সমগ্র মানব প্রজাতির শত্রু বানিয়ে তোলে। জন্ম হয় রাসায়নিক কীটনাশক ভিত্তিক চাষ পদ্ধতির। কম্পানীগুলো তাদের নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র পেয়ে লগ্নী শুরু করে। মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিবর্তিত হয় পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। বন্ধুপোকা, 'শত্রু' পোকা সবাই ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ হতে শুরু করে। এমন এক ভয়াবহ রক্তাক্ত সশস্ত্র যুদ্ধকে কম্পানি এবং তাদের সমর্থক রাজনৈতিক মুরুব্বিবৃন্দ নাম দেয় সবুজ বিপ্লব-পরিবর্তনের রক্তাক্ত চিত্রের পরিবর্তে স্নিগ্ধ শান্ত হরিৎ ক্রান্তি!

তারপর জল গড়িয়েছে অনেক দূর। এই পোড়া ভারতে সম্পূর্ণ শান্তির সময়ে গত পাঁচ বছরে কীটনাশক খেয়ে মানুষ মরেছে প্রতি পাঁচ ঘন্টায় একজন। আর রাসায়নিক কীটনাশক তার প্রত্যাশিত মারণক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রস্ত চাষী আত্মহত্যা করেছে প্রতি আধ ঘন্টায় একজন। স্নিগ্ধ বিপ্লবের পেলব পরিণতি!

ইতিমধ্যে কীটনাশক ব্যাপ্যারীদের 'স্বাভাবিক' বন্ধু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে পেট্রোকেমিক্যাল কম্পানীগুলো। তারা জীবাশ্ম তেল পরিশোধন করে বাজারে ছাড়তে শুরু করে, সঙ্গে অনুসারী পদার্থ হিসেবে রাসায়নিক কীটনাশকের কাঁচামাল মৃত্যু ব্যবসায়ীদের যোগান দেয়। এদের যুগলবন্দী চলছে সমানে-বাজার দখলের স্থানীয় সমস্যা পর্যবসিত হয়েছে এই প্রাণবন্ত গ্রহটির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে। প্রকৃতির পরিশোধ বড় নির্মম-তা কখনও আসে হিমযুগ হিসেবে, কখনও ভূমিকম্প অগ্ন্যুপাত, কখনও বা ভূ-উষ্ণায়ণ! মুনাফা আর মানবিকতার দ্বন্দ্বে আপাতত মুনাফার জয়গান — শ্মশানযাত্রার শোকগাথার অপেক্ষায়!

তিন ঃ ভোপাল ঃ অন্য আমেরিকার একটি নাটক

আমি নাট্যসমালোচক নই—পেশাদারি বা শখের, কোনো অর্থেই নয়। আমি নাটক দেখতে ভালোবাসি—এইমাত্র। সেই সূত্রেই পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি আয়োজিত ২০১২-র নাট্যমেলায় হাজির হয়েছিলাম। এই নাট্যমেলায় তেসরা ডিসেম্বর, ২০১২ রবীন্দ্রসদনে "ভোপাল" নামে একটি ইংরেজি নাটক দেখে মুগ্ধ হলাম। নাটকটি আমেরিকার এপিক অ্যাক্টরস্ ওয়ার্কশপ এবং বল্ড স্ট্রিট থিয়েটারের যৌথ প্রযোজনা। ২০১২-তে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় আমেরিকায়। কলকাতায় আমরা দেখলাম দ্বিতীয় অভিনয়। নাটকটির পরিচালক

একজন আমেরিকান, লেখক একজন কানাডা প্রবাসী ভারতীয়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে আমেরিকানদের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়রাও রয়েছেন। নাটকটির সামগ্রিক উপস্থাপনা আমার খুব ভালো লেগেছে। তবে যে কারণে এই লেখার উদ্যোগ, তা হোলো একটি বিদেশী নাট্যদল—যাতে প্রবাসী ভারতীয়রাও আছেন— তার নিজের দেশেরই একটা বহুজাতিক কোম্পানির অপকর্মের তথ্যসমৃদ্ধ স্বরূপ উন্মোচন করেছে নাটকের মাধ্যমে, খুবই দক্ষতার সঙ্গে। নাটকটি দেখে মনে পড়ল, দুটো আমেরিকা রয়েছে। একটা কর্পোরেট আমেরিকা—যেটা ব্যবসায়ীদের এবং তাদের প্রভাবাধীন মানুষের আমেরিকা। এই কর্পোরেট আমেরিকার কথাই আমরা খবরের কাগজে বেশি পড়ি। কর্পোরেট আমেরিকাই ভোপালকাণ্ডের হোতা। কিন্তু আরেকটা আমেরিকাও রয়েছে। সেটা কর্পোরেট বিরোধী আমেরিকা। এই দ্বিতীয় আমেরিকা থেকে অল্প কয়েকজন মানুষ ভারতে এসে নাটকের মাধ্যমে কর্পোরেট আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেলেন।

ভোপালের ঘটনা তিরিশ বছরের পুরোনো হোলেও তার জের এখনও চলছে। ভোপালের প্রাণে বেঁচে যাওয়া গ্যাসপীড়িতদের এখনও সুবিচারের জন্য আন্দোলন ক'রে যেতে হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটক তিরিশ বছরের পুরোনো মারণযজ্ঞ নিয়ে হলেও এখনও প্রাসঙ্গিক। এই নাটক দেশে বিদেশে যত বেশি অভিনীত হবে, ততই ভালো।

চার ঃ চায়না ভ্যান

চীনা আগ্রাসনের হাত থেকে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থাও নিস্তার পায় নি। চীনদেশ থেকে আমদানি করা ইঞ্জিন লাগিয়ে প্রায় প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই ইঞ্জিন ভ্যান। অনেকটা সাইকেল ভ্যানের মতই দেখতে হলেও বাস্তবে গতি ও বহন ক্ষমতা অনেকটাই বেশি, ১০-১২ জন যাত্রী বা ৫০০ -৬০০ কেজি পণ্য নিয়ে ঘন্টায় ২০-২৫ কিমি পথ চলতে পারে। জ্বালানি ডিজেল, কেরোসিন বা কাটাতেল যা যেখানে পাওয়া যায়। জ্বালানি খরচ এক থেকে দেড় টাকা প্রতি কিলোমিটার। যাত্রী প্রতি ১০ পয়সা কিলোমিটার তারও কম। তাই শহর বা শহরতলির বুকে অটো রাজ চললেও, গ্রামে গঞ্জে তাদের দেখা পাওয়া ভার। ইঞ্জিন ভ্যানের দৌরাত্ম্যে ভয়েই পালিয়ে বেড়ায়। শুধু অটোই নয় বাসও সমীহ করে চলে, কারণটা ভাড়া। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে ইঞ্জিন ভ্যানের ভাড়া বাসের চেয়েও কম। কেন এই রমরমা? প্রথমত ইঞ্জিনভ্যানের দাম খুবই কম ৪০ থেকে ৪৫ হাজার হলেই পাওয়া যায়। কোন ধরনের সরকারি নকশা নেই বলেই যে যার মত তৈরি করছে। ক্রেতাও কিনে নিয়ে যাচ্ছে, চলছে রমরমিয়ে। তাই কোথাও দেখা যাবে স্কুটারের চাকা, কোথাও বা বাইকের। বাইকের চাকার Spoke গুলোকে আরও শক্তিশালী করতে পাশাপাশি Spoke'র চেয়ে একটু মোটা রড ঝালাই করা। কোথাও কোথাও দেখা গেছে অ্যামব্যাসাডার বা এই ধরনের গাড়ির চাকা লাগানো। চালকের কোন গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নেই। নেই Driving Licence, অবাক কাণ্ড, ইঞ্জিন ভ্যানের কোন রেজিস্ট্রেশনও লাগে না। অথচ শকট যান থেকে সাইকেল ভ্যান যে কোন জন পরিবহনের একটা রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়। হয়ত সেটা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভার থেকে। তবে কেন ইঞ্জিন ভ্যানের থাকবে না? তার উত্তর কেউ জানেন না। জানার চেষ্টাও কেউ কোনদিন করেননি। ইঞ্জিনচালিত তাই হামেশাই অ্যাক্সিডেন্ট। হয় পথচারী নয় যাত্রী। এমন দেখা গেছে ইঞ্জিন ভ্যান উল্টে, যাত্রীর গোটা দেহ পুড়ে গেছে গরম জলে। চোখও নষ্ট হয়েছে। মারা গেছেন সাইকেল আরোহী ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কায়। কোথাও কোন পুলিশ কেস হয় না। পান না কেউ তৃতীয় পক্ষের বিমার সুযোগ সুবিধা, অথচ আমাদের দেশে অন্য সব ধরনের মটরগাড়ির থাকে রেজিস্ট্রেশন। পথচারি বা যাত্রী, যে কোন অ্যাক্সিডেন্টে পান তৃতীয় পক্ষের বিমার সুযোগ সুবিধা, সরকার যদি ইঞ্জিনভ্যানের দিকে একটু নজর দেন তবে রাজস্ব আদায় হবে। পথচারী ও যাত্রী পাবে তৃতীয় পক্ষের বীমার সুযোগ সুবিধা, সরকার বাহাদুর ভাববেন কি?

সংকলন ও রচনা :

শুভাশিস মুখার্জি, ভাস্কর মৈত্র ও রবীন ব্যানার্জি

With Best Compliments From :

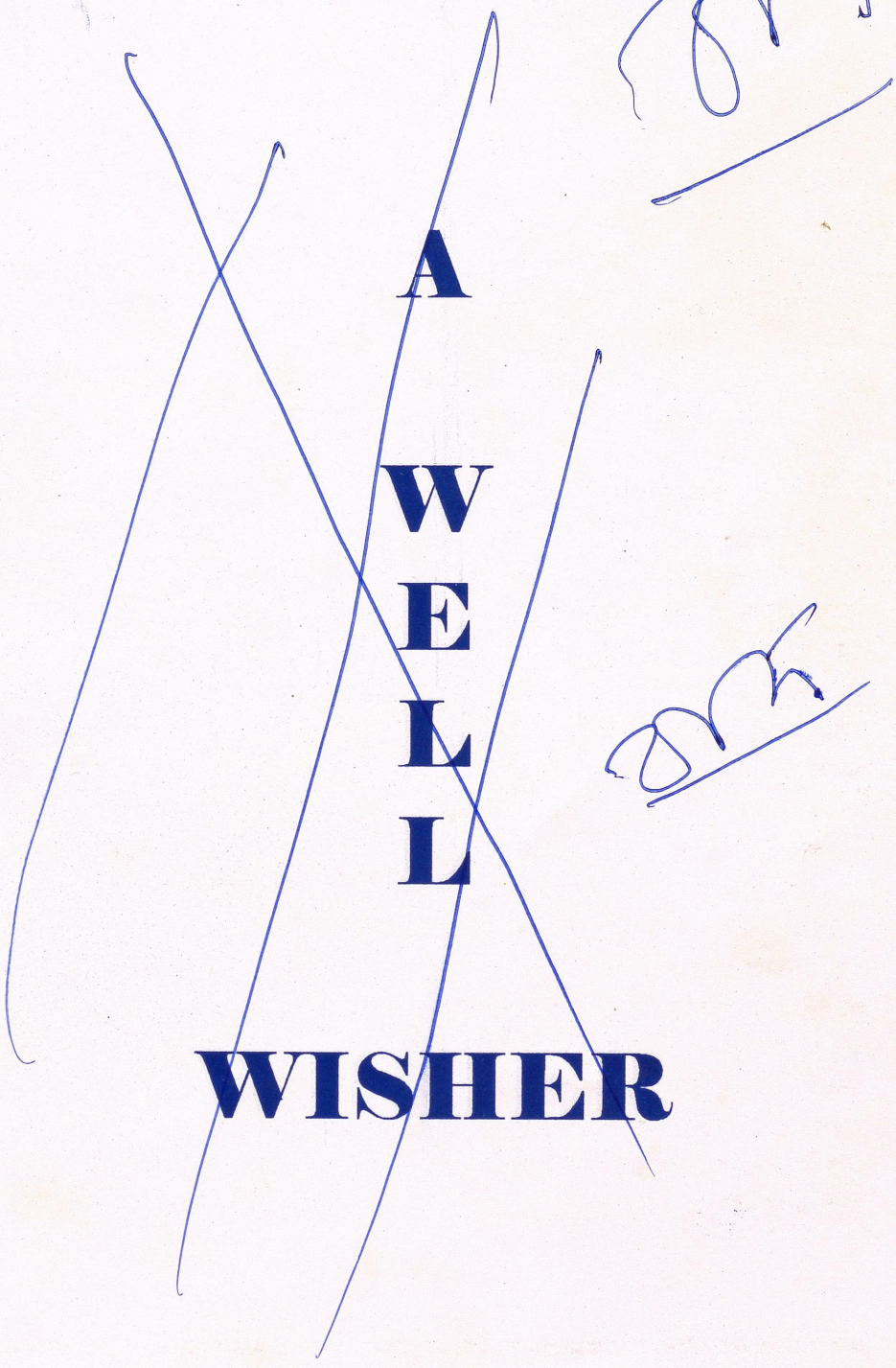

Vigyan O Vigyankarmi
Rn.No.34929/79

Rs. 25.00

Vol. XXXIV No. 14
January 2012-December 2012

সুস্থ থাকো বন্ধুরা

যাদের ভরসায় প্রেরণায় বিওবি'র পথচলা তাদের অনেকেরই অসুস্থতা আমাদের বিদ্ধ করছে। এই গতবছর পর্যন্ত স্বপনকে (ডা. স্বপন দাস) ছাড়া ভাবা যেতো না বিওবি প্রকাশের কথা। প্রায় গৃহবন্দী থেকে স্বপন এখন সুস্থতার জন্য দারুণ লড়াই করছে।

অসুস্থ সৌমেন গুহ ও তার স্ত্রী লতিকা। অসুস্থ পার্থ (সেন), অসীম (মুখার্জী)। আমরা তাদের সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

ভালোভাবে সুস্থ হয়ে ওঠো শিগগির। ফিরে এসো বিওবি'র আড্ডায়।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে শান্তি অফসেট, কলি - ৯ থেকে মুদ্রিত।